নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫

BANSDOC Library
Dhaka

- পৃথিবী বদলানো আবিষ্কার : "ন্যানোটেকনোলজি"
- টেকসই কৃষি : আমাদের প্রত্যাশা
- সূর্য ভিটামিন
- আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫

ডায়েরী নং
তারিখঃ
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
সৈকত সরকার
উপ-প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা
জনাব পপি মণ্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা / মুদ্রণালয় :
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

সূচিপত্র

- পৃথিবী বদলানো আবিষ্কার 'ন্যানোটেকনোলজি' – ১
  – সৌমেন সাহা
- টেকসই কৃষি : আমাদের প্রত্যাশা – ১৭
  – ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
- নিরাপদ ফল উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি – ২০
  – ড. মোঃ শরফ উদ্দিন
- স্মৃতিশক্তির নানা কথা – ২৪
  – মোঃ নজরুল ইসলাম
- আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি – ২৯
  – শহিদুল ইসলাম
- সূর্য ভিটামিন – ৩৩
  – আমানুল ইসলাম

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয় হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরোক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

Dhaka

মুখবন্ধ

বাঙালি জাতি ইতোমধ্যে গর্ব ভরিয়া উল্লেখ করিতে পারে যে পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জাতি হইতে তাহারা বর্তমানে নিম্নমধ্য আয়ের জাতিতে উন্নীত হইয়াছে। এই অগ্রযাত্রার মূল চালিকাশক্তি ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হইতে প্রকাশিত 'নবীন বিজ্ঞানী' নামক ত্রৈমাসিকের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার নিত্য নতুন তথ্যসমূহ তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং তরুণ বিজ্ঞানীগণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চিন্তা-চেতনাকেও একইভাবে অন্যদের মাঝে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বাঙালি জাতির গর্বের এই বিজয়ের মাসে প্রকাশিত আলোচ্য সংখ্যাটিতে ৬টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হইয়াছে। এই প্রকাশনায় যে সকল বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি রহিল অপরিসীম ধন্যবাদ। প্রকাশনাটির বাস্তবরূপ দিতে এই প্রতিষ্ঠানের যেই সকল কর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আলোচ্য প্রকাশনার মান উন্নয়নে সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ কাম্য। আশাকরি এই প্রকাশনাটি আরো জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও মতামতসহ নতুন আঙ্গিকে আরও সুন্দর কলেবরে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে। সকল শুভানুরাগীর জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

পৃথিবী বদলানো আবিষ্কার 'ন্যানোটেকনোলজি'

সৌমেন সাহা

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, বাংলায় যার অর্থ করলে দাঁড়ায়– প্রয়োজনের তাগিদেই আবিষ্কারের জন্ম লক্ষ লক্ষ বছর আগের সেই আদিম মানুষের প্লাইস্টোসিন যুগ থেকে পথচলা শুরু হয়েছিল আমাদের। একসময় সে বিদ্যাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত, আজ সে-ই চালিকাশক্তি। বিবর্তনের পথ বেয়েই এসেছে যন্ত্র প্রযুক্তি বলা যায় একে অপরের হাত ধরে। ক্রমে ট্রানজিস্টর-ব্যাটারি-টেলিভিশন, কম্পিউটারের জগৎ থেকে আজ আমরা প্রবেশ করেছি ন্যানোর জগতে। বিবর্তনের চাকা যতই এগোচ্ছে, ততই আমরা ন্যানোপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছি। কিন্তু ন্যানোপ্রযুক্তি আসলে কী? তার উৎস ব্যবহার, অগ্রগতি নেপথ্য কারিগর কারা, তা আজও আমরা অনেকেই জানি না। ন্যানোপ্রযুক্তি সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচিতি দিতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ার দিকে টিমটিম করে ন্যানোপ্রযুক্তির জয়যাত্রা শুরু হলেও এই কয় বছরেই 'ন্যানো' শব্দটি যেন বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের ঠোঁটের ডগায় পৌঁছে গেছে। এক ধাক্কায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দে (২০০৭) পরিণত হয়েছে ন্যানো। অনেকটা ভৈরবী রাগের মতোই– 'ন্যানো' যেন এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ন্যানোপ্রযুক্তি এখন কাঁপিয়ে দিচ্ছে গোটা পৃথিবীকে জায়গার সমস্যা যত বাড়ছে, ততই যেকোনো জিনিসকে খুদে থেকে খুদেতর করার প্রয়াস বাড়ছে। এটাই স্বাভাবিক খুদে হলো, অথচ তার মমতা কমল তো না-ই, বেড়ে গেল বহুগুণ। হয়তো এমন দিন শিগগিরই আসতে চলেছে, যখন আমরা আমাদেরই একেবারে ছোট করে ফেলার বিদ্যাটাও শিখে ফেলব। ন্যানো মানুষ! সেদিন পৃথিবীতে জায়গার সংকুলান নিয়ে আর ভাবতে হবে না। ভাবতে হবে না খাদ্য-সমস্যা নিয়েও! কী দারুণ হবে সেদিন!

গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক, তার গন্ধ তো একইরকম মিষ্টি থাকবে। নামে কী আসে যায়? সেই ১৫৯৪ সালের রোমিও-জুলিয়েট মহাকাব্যেই তো এ কথা লিখে ফেলেছিলেন মহাকবি শেক্সপিয়ার। ঠিকই তো! ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি ভারতের নয়াদিল্লিতে ভিড়ে ঠাসা প্রগতি ময়দানে যে গাড়ির উপর থেকে রহস্যময়ী আবরণটুকু সরিয়ে নিলেন সত্তরোর্ধ্ব রতন টাটা–দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট সেই গাড়ির নাম দিলেন 'ন্যানো'! হয়তো তার নাম অন্য কিছু হতে পারত। কিন্তু যে পুঁচকে গাড়ির চালকের আসনে স্বয়ং রতন টাটা, তার নাম 'ন্যানো' ছাড়া অন্য কিছু ভাবাটাও বোধহয় দুষ্কর। আর আধুনিক ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার তো অনস্বীকার্য। ঠিক সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছোট্ট গাড়ি 'ন্যানো' যখন এসে দাঁড়াল, তাকে প্রথম দর্শনেই মনে হবে টাটা মোটরসের ডিজাইন টিম যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সেরাটা উপহার দিতে। 'ন্যানো' শব্দটি যেন আরও অনেক বেশি পরিচিত হলো সেদিন থেকে।

ন্যানো শব্দটি আসলে কী?

এককথায় ম্যাট্রিক পদ্ধতির দৈর্ঘ্যের একক। শব্দটির জন্ম ১৯৬০ সালে। তবে ১৯৬৭ সাল থেকে ন্যানো শব্দটির পরিচয় বাড়তে থাকে। গ্রিক শব্দ 'ন্যাবাস' থেকে ন্যানো শব্দের উৎপত্তি। এক মিটারের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ কিংবা এক মিলিমিটারের এক মিলিয়ন ভাগের (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) এক ভাগকে ন্যানোমিটার বলে। তবে ন্যানোই দৈর্ঘ্য পরিমাপক ক্ষুদ্রতম ইউনিট নয়। ন্যানোকে n দিয়ে সূচিত করা হয় ন্যানোর ঠিক আগের এককটি হলো মাইক্রো। আবিষ্কার ১৯৬০ সালেই। μ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ন্যানোর ঠিক পরের এককটি হলো পিকো। p দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ন্যানোর শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'ডোয়ার্ফ'। বাংলায় যাকে বলে বামন। আলোক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপতে, ন্যানো প্রযুক্তিতে কিংবা অর্ধপরিবাহী তৈরিতে ন্যানোমিটার একক ব্যবহার করা হয়। এক ন্যানোমিটার আবার ১০ আংস্ট্রমেরও সমান। ন্যানোপ্রযুক্তির বিভাগ হিসেবে কার্বন ন্যানোটিউব, ন্যানোকণা, ন্যানো ওষুধ অর্থাৎ ন্যানোমেডিসিন, ন্যানোটক্সিকোলজি, ন্যানো-ইলেকট্রনিক্স, ন্যানোসেন্সর, ন্যানোলিথোগ্রাফি, ন্যানোরোবোটিক্স, মেক্যানোসিনথেসিস—সর্বত্রই আজ 'ন্যানো' শব্দটি 'উপসর্গ' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

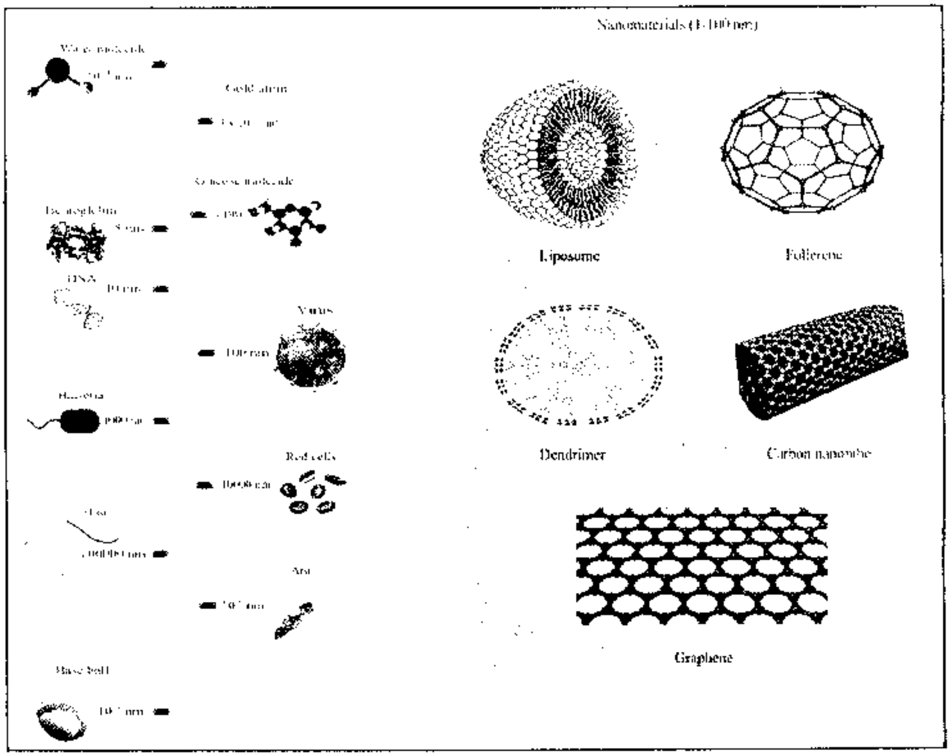

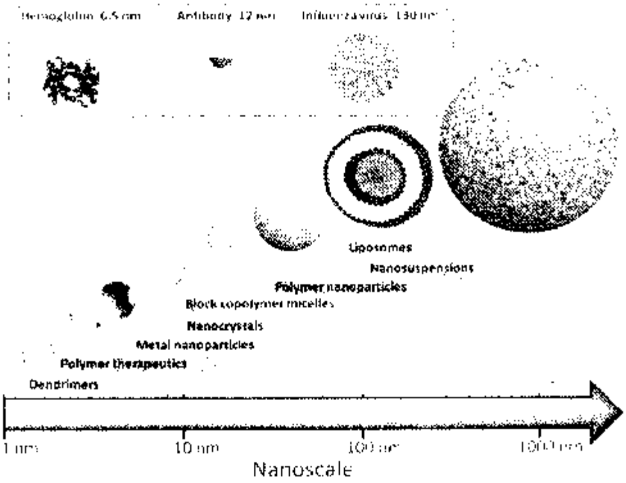

ম্যাক্রো থেকে মাইক্রোর পথ ধরে

পৃথিবীর উপর যেভাবে চাপ বাড়ছে, তাতে সবকিছু ছোট করে দেওয়াটাই বোধ হয় ভবিষ্যৎ। না হলে এত মানুষ, এত কারখানা জায়গা পাবে কোথায়? পৃথিবী তো আর ক্রমশ বাড়ছে না। তাই বহুদিন ধরেই ম্যাক্রো থেকে মাইক্রোর পথ ধরেছে মানুষ। ১৭৯৫ সালেই যেখানে কিলো, হেক্টো, ডেকা, ডেসি, সেন্টি বা মিলি-র আবিষ্কার হয়ে গেছে, সেখানে মাইক্রোতে এসে পৌঁছাল ১৯৬০ সালে। মাইক্রোকে µ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। মাইক্রো হলো ১ এর ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ ($১০^{-৬}$)। আর ন্যানো হলো ১ এর ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ ($১০^{-৯}$)। আগে যেমন ঢাউস আকারের গাড়ি বা যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হতো, আজ আর তা তৈরিই হয় না। অন্যদিকে বাড়াতে হচ্ছে নিরাপত্তাও। ন্যানোপ্রযুক্তির সাফল্য এখানেই। ক্রমশ ছোট অথচ শক্তিশালী হচ্ছে সবকিছুই। বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যবহার হচ্ছে মাইক্রোচিপস। আবার সেই কম্পিউটার তত ভালো, যেটি যত ছোট অথচ প্রচুর প্রোগ্রাম করা বা ধরে রাখা যায়। ইলেকট্রনিক্স জগতের সর্বত্রই আজ ন্যানোপ্রযুক্তির ছড়াছড়ি। অন্যদিকে ক্যামেরা, সিডি বা ডিভিডি বা ইঙ্কজেট প্রিন্টারের কথা ধরলে দেখা যাবে, এগুলো যত ছোট হচ্ছে, ততই আধুনিকতার মোড়কে বন্দি হচ্ছে। ম্যাক্রো থেকে মাইক্রোর পথ ধরে এখন ন্যানোর দিকেই হাঁটছে গোটা পৃথিবী।

ন্যানোপ্রযুক্তি : ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ

১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আমেরিকান ফিজিকাল সোসাইটির আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার চলছে। বক্তা : বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও অর্ধপরিবাহীর জনক রিচার্ড ফেইনম্যান। বিষয় : দেয়ারস প্লেন্টি অফ রুম অ্যাট দ্য বটম। বক্তব্যে উঠে এলো প্রতিটি অণু-পরমাণুকে কীভাবে পরিবর্তন করে নতুনভাবে তৈরি করা যায়, সেই প্রসঙ্গ। ন্যানোপ্রযুক্তির ভাবনা বোধহয় সেদিন থেকেই তিনি বিজ্ঞানীদের মনে গেঁথে দিয়ে গেলেন।

১৯৬০ সালে ন্যানো শব্দটি জন্ম নিল পৃথিবীতে। এর ১৪ বছর পর ১৯৭৪ সালে টোকিও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরিও তানিগুসি সর্বপ্রথম একটি পেপারে 'ন্যানোটেকনোলজি' বা ন্যানোপ্রযুক্তি শব্দটি ব্যবহার করলেন। দিলেন ব্যাখ্যাও। আটের দশকে একেই আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন ড. এরিক ড্রেক্সলার। এরপর অবশ্য বিভিন্ন সময়ে 'দ্য কামিং এরা অফ ন্যানোটেকনোলজি', 'ন্যানোসিস্টেমস', 'ন্যানোটেকনোলজি অ্যান্ড ন্যানোসায়েন্স' নামে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এসেছে কার্বন ন্যানোটিউব।

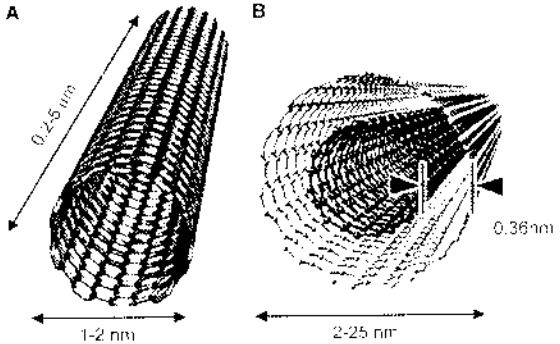

বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্তমানে তো বটেই, ভবিষ্যতেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ন্যানোপ্রযুক্তি বিশেষ করে জীববিদ্যা, আণবিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র সর্বত্রই ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। মোবাইল ফোনের কথাই ধরা যাক না। গত কয়েক বছরে মোবাইল সেটের এই যে গঠনগত নাটকীয় পরিবর্তন। এ তো ন্যানোপ্রযুক্তিরই সুফল। যত দিন যাচ্ছে, ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারে মোবাইল ছোট, আধুনিক, দ্রুত ও সস্তা হচ্ছে।

ন্যানোপ্রযুক্তির অন্যতম সাফল্যের কেন্দ্র ওষুধ শিল্পে ও অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ তৈরিতে। অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ (AFT) এবং স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ (STM) ন্যানোপ্রযুক্তির ফসল। ন্যানোপ্রযুক্তির ছাতার নিচে রয়েছে আধুনিক কলয়েড বিজ্ঞানও।

ন্যানোপ্রযুক্তি : দুই পদ্ধতি

ন্যানোপ্রযুক্তিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১) বটম-আপ অ্যাপ্রোচ : অর্থাৎ আণবিক বা পারমাণবিক স্তর থেকে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের বস্তু বা উপাদান তৈরি করা হয়। অর্থাৎ ছোট যৌগ থেকে বড় ও জটিল যৌগ তৈরি। ডিএনএ গঠন করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আণবিক রসায়নেও এর প্রয়োগ রয়েছে

২) টপ-ডাউন অ্যাপ্রোচ : অর্থাৎ ঠিক এর উল্টো। ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে বড় ধরনের কোনো উপাদান থেকে নতুন অণু বা পরমাণু তৈরি করা হয়। যেমন– প্রচলিত পদ্ধতিতে সলিড-স্টেট সিলিকন মাইক্রোপ্রসেসর থেকে ১০০ ন্যানোমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের যন্ত্রপাতি তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। ২০০৭ সালে স্পিনট্রোনিক্স বিষয়ের আওতায় জায়েন্ট ম্যাগনেটোরেসিস্ট্যান্স নিয়ে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য পিটার গ্রুনবার্গ এবং অ্যালবার্ট ফার্ট নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ন্যানোলিথোগ্রাফি, ন্যানোইলেকট্রো-কেমিক্যালস, আণবিক ইলেকট্রনিক্স থেকে ন্যানোগাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরিতে এ পদ্ধতিই কাজে লাগানো হচ্ছে। আবার ন্যানোটিউব, প্রসাধনী, লোশন কিংবা কোয়ান্টাম 'ডট' তৈরিতেও টপ-ডাউন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে.

ন্যানো ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন জিনিসে যে ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়, তার আধুনিকীকরণের অন্যতম ধাপটি হলো ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার। অর্থাৎ ন্যানো ইলেকট্রনিক্স। সংকর অণু, মাইক্রোচিপ, অর্ধপরিবাহী, একমাত্রিক ন্যানোটিউব, ন্যানোতার ইত্যাদি হলো ন্যানোপ্রযুক্তির ফসল। সাব-ভোল্টেজ এবং ডিপ সাব-ভোল্টেজ ন্যানো ইলেকট্রনিক্স হলো এখনকার গবেষণার মূল বিষয়, যা পরে কম্পিউটার বা ক্যালকুলেটরে আইসি তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে এদের শক্তি সংরক্ষণ ক্ষমতা হলো ১ বিট।

ন্যানো ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রনিক্সের এই শাখার অন্যতম দিক হলো ন্যানোসার্কিট তৈরি ও তার ব্যবহার কম্পিউটার চিপে ১ ন্যানোমিটার (১০টি হাইড্রোজেন অণুর সমান) মাপের ন্যানোসার্কিট খুব সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব। এতে কম্পিউটারের গতি অনেকটাই বাড়ে। এছাড়া ইন্টারনেটের সংযোগের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবারের কেবল তৈরিতেও ন্যানো ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রনিক কাগজ, সৌরকোষ তৈরিতেও এই প্রযুক্তি কাজে লাগে

ন্যানো কম্পিউটার

এটি হলো এক বিশেষ ধরনের কম্পিউটার যা আজকের মাইক্রোকম্পিউটারের চেয়েও ছোট। আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলা যায়, ন্যানোকম্পিউটার হলো এমন এক কম্পিউটার, যার যন্ত্রাংশগুলোর মোট দৈর্ঘ্য খুব বেশি হলে এক ন্যানোমিটার হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাইক্রোপ্রসেসরের এ যাবৎকালের মধ্যে ক্ষুদ্রতম যন্ত্রাংশের দৈর্ঘ্য ২০০৮ সালের হিসাব অনুসারে ৪৫ ন্যানোমিটারের বেশি নয়। তাই সাধারণত বিজ্ঞানের পরিভাষায় এবং কল্পবিজ্ঞানের গল্পেই মূলত এটি ব্যবহার হচ্ছে।

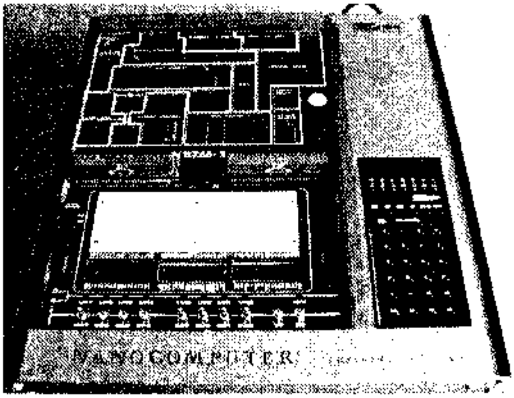

ন্যানো কম্পিউটার

শুধুমাত্র অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করেই ন্যানোকম্পিউটার তৈরি হয়–এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইলেকট্রনিক, জৈব রাসায়নিক, মেকানিক্যাল, কোয়ান্টাম প্রযুক্তির যেকোনো একটি ব্যবহার করেই ন্যানো কম্পিউটার তৈরি সম্ভব।

ন্যানো অ্যাবাকাস

এটি হলো বিখ্যাত কম্পিউটার সংস্থা আইবিএম-এর তৈরি খুব ছোট আকারের একটি অ্যাবাকাস। এর রোলিং তৈরি হয় ১০টি অণু দিয়ে। আর বিডগুলো তৈরি হয় ফুলেরিন দিয়ে। ন্যানো অ্যাবাকাসকেই ন্যানোকম্পিউটারের মূল ভিত্তি বলে ধরা হয়।

ন্যানোকম্পোজিটস

ন্যানোপ্রযুক্তির একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে ন্যানোকম্পোজিটস। ধরা যাক, কোনো তাপ ও তড়িৎ পরিবাহী যৌগে কার্বন ন্যানোটিউব ব্যবহার করা হলো। এর ফলে দুটি মিলে যে নতুন যৌগটি তৈরি হলো, সেটিকে ন্যানোকম্পোজিটস বলে। মাইক্রোস্পার্কিং নমুনা হিসেবে এটিকে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। খুব কম বা নগণ্য ওজনের ন্যানোকণা (০.৫–৫ শতাংশ) এই ধরনের ন্যানোকম্পোজিটস যৌগে কাজে লাগে। অনেক সময় ম্যাট্রিক্স জাতীয় বস্তুর সঙ্গে ন্যানোকণা যুক্ত করে ন্যানোকম্পোজিটস জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়।

ন্যানোফেব্রিক্স এবং ন্যানোফাইবার

ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রতারিত করতে বা শত্রুপক্ষকে চোখে ধুলো দিতে এখন ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার করে ন্যানোফেব্রিক্স তৈরি হচ্ছে। জিনিসটা এমনই যে, ন্যানোফেব্রিকের পোশাক গায়ে পরলে তাকে আর দেখাই যাবে না! কারণ আলো এর মধ্য দিয়ে প্রবেশে অক্ষম। ২০০৬ সালের শীতকালীন অলিম্পিকে প্রথম ন্যানোফেব্রিকের ব্যবহার নজরে আসে। ১০০ ন্যানোমিটার ব্যাসের ফাইবারকে ন্যানোফাইবার বলে।

ব্যবহার-

চিকিৎসাবিজ্ঞান : কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন, টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং, নতুন ওষুধ তৈরি।

শক্তি উৎপাদন : ব্যাটারি, ফটোভোল্টেইক কোষ, মেমব্রেন ফুয়েল কোষ।

টেক্সটাইল-স্পোর্টস : জুতা, শিশুদের ন্যাপকিন, বর্ষা থেকে বাঁচার জামাকাপড় ইত্যাদি।

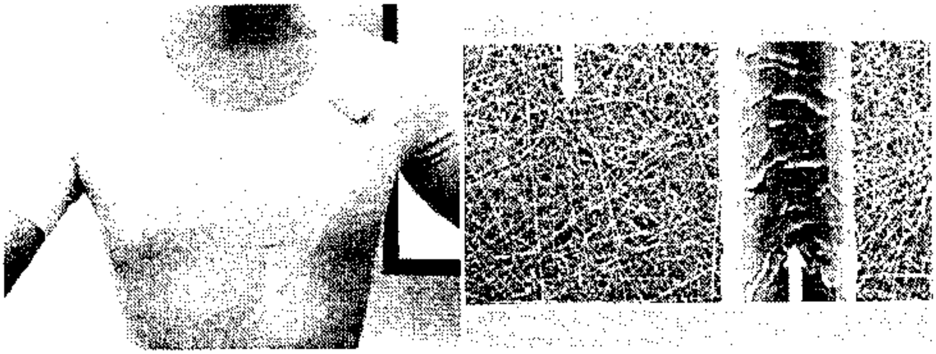

ন্যানোফেব্রিক্স এবং ন্যানোফাইবার

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তি

ন্যানোপ্রযুক্তির এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানে, ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে। দেহের কোনও অংশে টিউমার হলে এম.আর.আই (ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং)-এর সঙ্গে 'কোয়ান্টাম ডট' জাতীয় ন্যানোকণা যোগ করে অতি সহজে টিউমারের ছবি তোলা হয় এবং স্পষ্টতর। অর্থাৎ ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এখনকার তুলনায় কম খরচে বেশি ভালো ছবি তোলা সম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন প্রশ্ন উঠছে–শুধু ছবি তোলা কেন? বিশেষ কোনো ধরনের ক্যান্সার প্রতিষেধকের গ্রুপ যদি ন্যানোকণার সঙ্গে জুড়ে টিউমারে আঘাত করা যায়, তাতে হয়তো সহজেই ক্যান্সারকে বাগে আনা যাবে। বিশেষ এই এক ধরনের থেরাপির নাম Kanzius RF থেরাপি।

চিকিৎসায় ন্যানোপ্রযুক্তির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো অসম রক্ত সঞ্চালনে এর ব্যবহার। স্নায়ুবিক রোগ মূলত হয় রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহের অভাবের জন্য। বাইরে থেকে পার্শ্বচাপ তৈরি করে ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে ন্যানোকণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও শরীরের নানা অংশের পরীক্ষায় স্বয়ংক্রিয় মলিকিউলার মেশিন তৈরিতে ন্যানোপ্রযুক্তি লাগে।

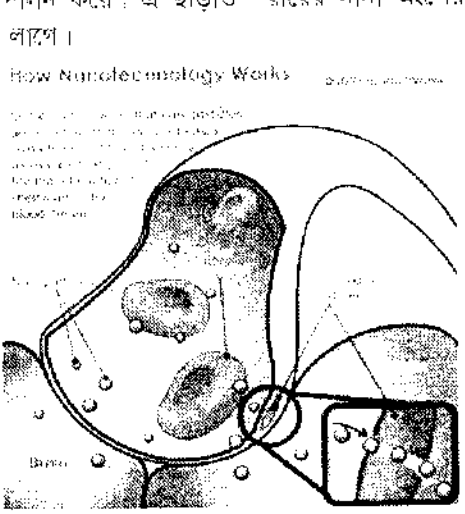

ক্যাডমিয়াম সেলেনাইডের ন্যানোকণার উপর অতিবেগুনি রশ্মি ফেলা হলে সেটা জ্বলজ্বল করে। বিজ্ঞানীরা এই কণাকে শরীরে ঢুকিয়ে টিউমার ও তা থেকে ক্যান্সার প্রতিরোধে ব্যবহার করছেন। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেনিফার ওয়েস্ট সোনার ন্যানোকণার আস্তরণ দেওয়া ১২০ ন্যানোমিটার ব্যাসের ন্যানোসেল তৈরি করে ইঁদুরের উপর সফল পরীক্ষা করেছেন। দেখিয়েছেন, এতে ক্যান্সার কমানো সম্ভব। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জেমস বেকার সম্প্রতি অত্যাধুনিক ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার করে ডেনড্রিমার নামে এমন এক অণু তৈরি করেছেন, যা ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষে আটকে যায়। পরে সেই কোষকে টেনে আলাদা করে আনে।

লিপিড বা পলিমার যৌগের ন্যানোকণা দিয়ে তৈরি ওষুধ আধুনিকতম চিকিৎসার প্রধান উপকরণ। ২০০৫ সালে আমেরিকায় 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ' পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪টি ন্যানোমেডিসিন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। অতি সম্প্রতি ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৩০টি ওষুধ সে দেশে তৈরি হয়েছে।

ন্যানোমেডিসিন

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফসল হলো ন্যানোমেডিসিন। আণবিক ন্যানোটেকনোলজি থেকে ন্যানোইলেকট্রনিক বায়োসেন্সর– সর্বত্রই ন্যানোমেডিসিনের ব্যবহার। ২০০৫ সালে আমেরিকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ ন্যানোমেডিসিন নিয়ে গবেষণার জন্য পাঁচ বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০৬ সালের এপ্রিলে 'নেচার' নামক বিখ্যাত পত্রিকার এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এখন সারা পৃথিবীতে ১৩০টি ন্যানোপ্রযুক্তি নির্ভর ওষুধের অস্তিত্ব রয়েছে।

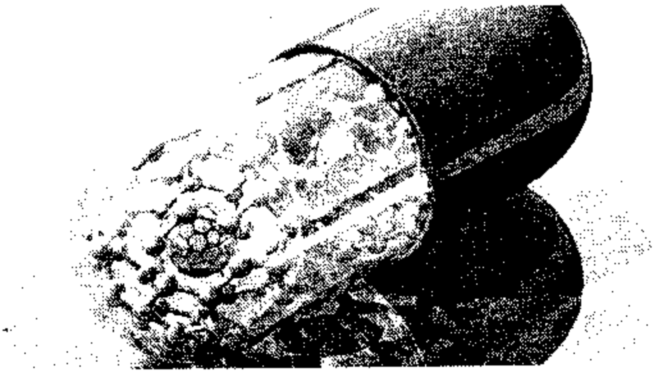

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফসল হলো ন্যানোমেডিসিন

ন্যানোমেডিসিন হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানে ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার এক বিরাট ক্ষেত্র। আর একটি পরিসংখ্যান দিলে অবাক হতে হয়। ২০০৪ সালে সারা পৃথিবীতে ন্যানোমেডিসিন বিক্রির অর্থের পরিমাণ প্রায় ৬৮ কোটি টাকা। ২০০টি কোম্পানি এই ওষুধ তৈরি করছে। আর ২০০৭ সালে বিক্রির অর্থের পরিমাণ আরও ৩৮ কোটি বেড়ে যায়। ৩৮টি নতুন ওষুধ কোম্পানি ন্যানোমেডিসিন নিয়ে বাজারে এসেছে। এই ওষুধ তৈরিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্যতার উপর গবেষণার উন্নতি নির্ভর করছে। শরীরের ঠিক যে অংশে অসুস্থতা, সেখানেই আক্রমণ করে ন্যানোমেডিসিন। সারিয়ে তোলে রোগকে। বিজ্ঞানীদের মতে, ন্যানোমেডিসিনে যত ন্যানোকণা ব্যবহার করা যাবে, ওষুধটি তত আধুনিক হবে। ন্যানোকণা ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির সহায়তায় তৈরি 'কোয়ান্টাম ডট' ক্যান্সারের মতো মরণরোগকে সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের ঠিক যে অংশের কোষে ক্যান্সার হয়েছে, সেখানেই কাজ করে ন্যানোমেডিসিন।

তবে এ অপেক্ষা এটি অনেক বেশি উজ্জ্বলও বটে। এমন কোনো ন্যানোমেডিসিন আবিষ্কার করা সম্ভব কি যেটি নিজে শরীরের রোগযুক্ত কোষগুলোকে চিহ্নিত করবে, প্রয়োজনে স্ক্যান করে নিজেই ছবি তুলবে এবং ও শেষে সেই নির্দিষ্ট কোষে চিকিৎসা শুরু করবে? বিজ্ঞানীদের মনে এখন এই একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

সম্প্রতি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জেমস বেকার দাবি করেছেন, তিনি ক্যান্সার রোগ নিরাময়কারী ন্যানোটেকনোলজি নির্ভর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। বেকার এর নাম দেন 'ডেনড্রাইমার'। এর মধ্যে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে ভিটামিন থাকে। আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলোতে ভিটামিনের পরিমাণ সাধারণ কোষের তুলনায় কম। তাই সেই কোষগুলো সহজেই অতিরিক্ত ভিটামিনযুক্ত ডেনড্রাইমারদের ঘিরে ধরে।

ন্যানোমেডিসিনের সর্বশেষ ধাপটি হলো মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে কম্পিউটারের সরাসরি যোগাযোগ। বিভিন্ন আঘাত বা দুর্ঘটনা তো বটেই, স্ক্লেরোসিস জাতীয় রোগ নিরাময়েও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ন্যানোনেফ্রোলজি

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ করে কিডনির চিকিৎসার অন্যতম একটি দিক, যাতে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজে লাগানো হচ্ছে ন্যানোমেডিসিন। চিকিৎসাশাস্ত্রে আণবিক স্তরে কিডনি কীভাবে কতটা প্রোটিন সংশ্লেষণ করছে বা কিডনির প্রোটিনের গঠন জানতে, কিডনির কোষীয় অঙ্গাণুর স্ক্যান করা ছবি বিশ্লেষণে এবং ন্যানোকণা এবং ন্যানোমেডিসিন ব্যবহার করে কিডনির রোগ সারানোর বিষয় গবেষণাই ন্যানোনেফ্রোলজির মূল বিষয়। আবার ন্যানোপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কোনো যৌগ তৈরি করে মূত্রনালির চিকিৎসাও করা হয়। নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারে কিডনির অসুখকে সারিয়ে তোলাও ন্যানোনেফ্রোলজির মধ্যে পড়ে।

আণবিক ন্যানোপ্রযুক্তি

ইঞ্জিনিয়ারিং ন্যানোপ্রযুক্তিকে যখন আণবিক স্কেলে ব্যবহার করা হয় (বিশেষ করে কোনো কিছু পরিমাপ করতে) তখন তাকে আণবিক ন্যানোপ্রযুক্তি বলে। বিষয়টি মূলত 'মলিকিউলার অ্যাসেমবার' নামে একটি যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এটি এমন একটি মেশিন, যা মেকানোসিনথেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে অণুর একেবারে ন্যানোস্তরে গিয়ে তার গঠন পরিবর্তন করে। ন্যানোপ্রযুক্তির সফলতম ব্যবহার হিসেবে এখন এটাই বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন ও সাধনা। বিশেষ করে জীববিদ্যায় তো এর ব্যবহার রোজ বেড়েই চলেছে।

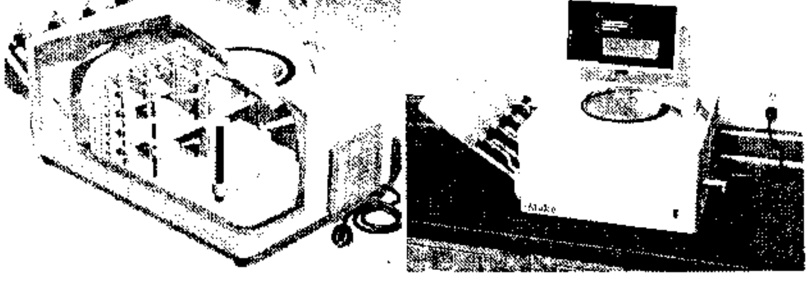

আণবিক ন্যানোপ্রযুক্তি

এরিক ড্রেক্সলার (তিনি অবশ্য জানতেন না নরিও তানিগুসি নামে অপর এক বিজ্ঞানী আগেই এই শব্দটির ব্যবহার শুরু করেছেন) যখন প্রথম ন্যানোপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে লিখলেন, তখনই তাঁর দৃষ্টি ছিল আণবিক ন্যানোপ্রযুক্তির দিকে। ড্রেক্সলার তাঁর বিখ্যাত বই 'ন্যানো-সিস্টেম'স'এ লিখেছেন, ভবিষ্যতে এমন দিন

আসলে যেখানে গাড়ির গিয়ার, বিয়ারিং, মোটরসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতে ন্যানোপ্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হবে। কার্লো মন্টেম্যাগনো নামে অপর এক বিজ্ঞানী আবার লিখছেন, ভবিষ্যতে সিলিকন প্রযুক্তি এবং জীববিদ্যায় আণবিক ন্যানো প্রযুক্তি মিশে যাবে। তবে কি বিজ্ঞান এমন দিকে এগোচ্ছে, যেখানে নতুন কোষ তৈরি হবে ন্যানোপ্রযুক্তির হাত ধরে? কিংবা নতুন প্রাণ! সময়ই শেষ কথা বলবে

লরেন্স বার্কলে ল্যাবরেটরি এবং ইউ সি বার্কেল ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে ড. অ্যালেক্স জেটল ও তার সহকারী গবেষকরা ২০০৪ সালেই অবশ্য আণবিক ন্যানোপ্রযুক্তির ৩টি আলাদা যন্ত্র তৈরি করে ফেলেছেন একটি ন্যানোটিউব ন্যানোমিটার, একটি মলিকিউলার অ্যাকচুয়েটর এবং তৃতীয়টি ন্যানোইলেকট্রো মেকানিক্যাল রিল্যাক্সেশন অসিলেটর। ডেস্কটপে ভোল্টেজ অর্থাৎ বিভব পরিবর্তন করেই এদের চালানো সম্ভব। আণবিক সুইচ ব্যবহার করে কার্বন মনোক্সাইড এবং লোহার অণুকে একসঙ্গে ন্যানোপ্রযুক্তির সাহায্যে গাড়ি তৈরিতে কাজে লাগানোর পরীক্ষায় সফলতা পেয়েছেন বিজ্ঞানী হো এবং লি, ১৯৯৯ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা করে

ন্যানোবাড (ন্যানোকুঁড়ি)

অনেকটা কুঁড়ির মতো দেখতে। কার্বন ন্যানোটিউব এবং ফুলেরিনস-এই দুই যৌগ মিলিতভাবে ব্যবহার করে ন্যানোবাড তৈরি হয়। সংকর এই যৌগ সম্প্রতি বিভিন্ন ধাতুতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষত আধুনিক যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতা বাড়াতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ন্যানোকণা

সাধারণত ১০০ থেকে ২৫০০ ন্যানোমিটার মাপের মসৃণ কণাকে ন্যানোকণা বলে। আরও ছোট কণার মাপ ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার মাপের হয়। তবে এলান ফর্মা সংস্থার ক্ষেত্রে 'ন্যানোক্রিস্টাল' শব্দটি পেটেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীর আর কোনো সংস্থার পক্ষে এই নামটি ব্যবহার সম্ভব নয়। আধুনিক ওষুধের একটি কণাকে ন্যানোকণা বলে। এক সময় যে ওষুধের ন্যানোকণা ব্যবসায়িক কাজে লেগেছে, এখন সেটা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ন্যানোকণা হয়তো আবিষ্কার করে ফেলেছে মানুষ।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ন্যানোকণা ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টের জন্মের অনেক আগেই ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন পাত্রে যে চকচকে রঙ ব্যবহার করা হতো, তাতেও ন্যানোকণা পাওয়া গেছে। মধ্য বা নবজাগরণের যুগেও সোনা বা তামার পাত্রে ধাতব ফিল্ম ব্যবহার করে ন্যানোকণাযুক্ত রঙের প্রলেপ দেওয়া হতো। তখনকার দিনের মানুষেরা তামা এবং রুপার লবণজাত বিশেষ রঙ তৈরি করতেন। এই রঙেই ন্যানোকণার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পাওয়া গেছে ন্যানো জিংক অক্সাইড এবং ন্যানো টাইটেনিয়াম-ডাই অক্সাইড কণাও

ন্যানোকণা

যেসব পদার্থের আয়তন খুব কম, কিন্তু পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল খুব বেশি তাদের ক্ষেত্রে ন্যানোকণাযুক্ত রঙের ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এইসব ন্যানোকণা খুব শক্ত এবং অনেকটা প্লাস্টিক পলিমার যৌগের কণার সমতুল্য। টেক্সটাইল শিল্পে জামাকাপড়ের সুতা তৈরি করতেও ন্যানোকণার প্রয়োগ আজ খুব বেশি।

ন্যানোফ্লাওয়ার

জাপানে একসময় ন্যানোটিউব নিয়ে গবেষণা করতে করতে ন্যানোফ্লাওয়ার তৈরি করে ফেলেছিলেন বিজ্ঞানীরা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলে অনেকটা ফুলের মতোই দেখতে লাগে। উত্তপ্ত গ্যালিয়ামের মধ্য দিয়ে মিথেন (CH_4) গ্যাস নির্দিষ্ট চাপে ও তাপে প্রবাহিত করা হলে তৈরি হয় সিলিকন কার্বাইড (SiC)। একেই পরে বিজ্ঞানীরা অনেকটা ফুলের রূপ দেন। অনেক সময় সালফার বা গন্ধকের বাষ্পে মলিবডেনাম-ডাই-অক্সাইডকে (MoO_2) উত্তপ্ত করা হলে ন্যানোফুল তৈরি হয়।

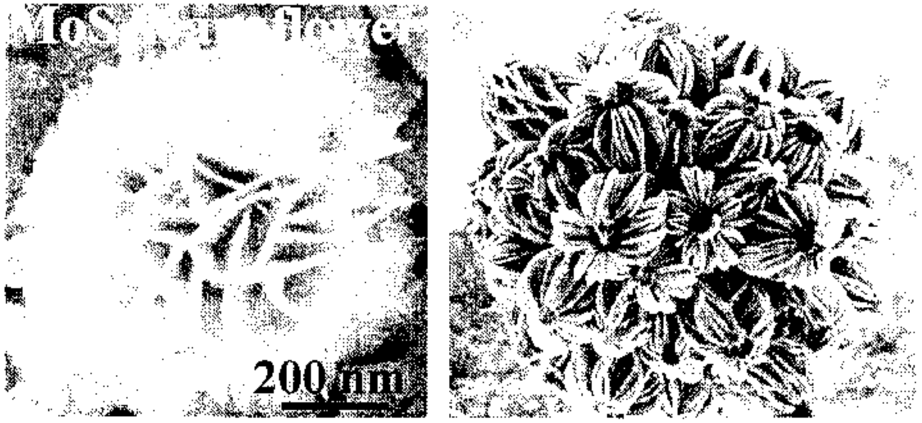

ন্যানোফ্লাওয়ার

ন্যানোমিডো বা ন্যানোতৃণভূমি

চীনের বেইজিং শহরের রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল ডিফেন্সের বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি এই ন্যানোতৃণভূমি তৈরি করেছেন। তাঁরা কার্বন ন্যানোটিউবের ঘাসের ন্যানো মাঠে ১০০ ন্যানোমিটার মাপের ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের ফাজি ফুল ফোটাতে সফল হয়েছেন। ট্যানটালাম ধাতুর পাতের উপর এই ফুল আরও ভালো ফোটে এবং গবেষণার আরও বেশি কাজে লাগে।

ন্যানোফোম

২০০৬ সালে লস অ্যালমস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে ড. ব্রাইস ট্যাপো নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম অ্যামিনের জটিল যৌগ দিয়ে ন্যানোফোম তৈরি করেন। লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, রূপা এবং প্যালাডিয়াম দিয়ে তৈরি ন্যানোফোম অনেকটা অনুঘটকের কাজ করে। এর ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১১ মিলিগ্রাম এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল প্রতি গ্রামে ২৫৮ বর্গমিটার।

ন্যানোরিং/ন্যানোরড

জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা প্রথম জিংক অক্সাইড থেকে এটি তৈরি করেছিলেন। দেখতে সত্যিই অনেকটা রিং-এর মতো। ন্যানোবেল্ট থেকে বারবার কয়েল তৈরি করার সময় এই ন্যানোরিং তৈরি হয়। অন্যদিকে ধাতু বা অর্ধপরিবাহী জিনিস থেকে ন্যানোরড তৈরি হয়। ডিসপ্লে প্রযুক্তি থেকে মাইক্রো-ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সিস্টেম তৈরিতে ন্যানোরড ব্যবহার করা হয়। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বেধ-এর ন্যানোসেল তৈরিতে এই ন্যানোরডকেই কাজে লাগানো হয়।

ন্যানোকেজ

সোনার মতো ধাতুর ফাঁপা ন্যানোকণা। ব্যাস হলো ১০ থেকে ১৫০ ন্যানোমিটার। সাধারণত সঙ্গে ক্লোরোঅরিক ($HAuCl_4$) এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ন্যানোকেজ কণা তৈরি হয়। এই কণার ইনফ্রারেড আলো শোষণের ক্ষমতা রয়েছে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক-অধ্যাপক ন্যানোকেজ তৈরি করেছিলেন। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ চিহ্নিত করে নষ্ট করতে সোনার ন্যানোকেজ কণাই এখন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহার করা হয়।

ন্যানোস্ট্রাকচার (ন্যানোগঠন)

আণবিক এবং আণুবীক্ষণিক আয়তনের মাঝামাঝি কোনো বিন্দুর গঠনকে ন্যানোস্ট্রাকচার বা ন্যানোগঠন বলে। আয়তনের উপর নির্ভর করে ন্যানোস্ট্রাকচার তৈরি করা হয়। ন্যানো পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে ০.১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার মাপের কণার যৌগ তৈরি করা হয়। কার্বন ন্যানোটিউবের মাপ একক, এবং একটু লম্বা। মাইক্রোমিটার রেঞ্জে কার্বন কণাযুক্ত আলট্রাফাইন পার্টিকল (UFP) তৈরিতেও ন্যানোস্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়।

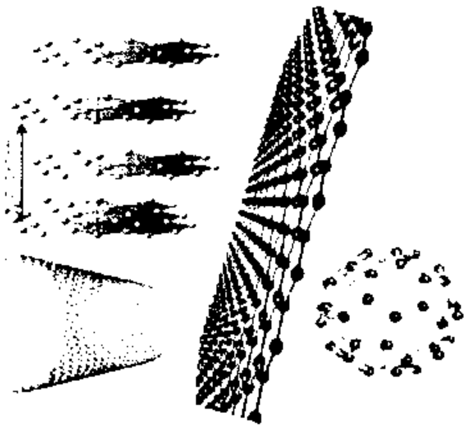

ন্যানোস্ট্রাকচার

ন্যানো জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা

ন্যানো প্রযুক্তিবিদ্যার এটি এমন একটি দিক সেখানে জৈববিদ্যা, জৈবরসায়ন এবং ন্যানোটেকনোলজি হাত ধরাধরি করে চলে। জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা বা বায়োটেকনোলজিতে ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারই হলো ন্যানোবায়োটেকনোলজি। এর সাম্প্রতিকতম ব্যবহারের উদাহরণ হলো, ন্যানোস্ফিয়ারের উপর ফ্লুওরেসেন্ট পলিমারের আস্তরণ। বিভিন্ন পলিমার থেকে নানা যৌগ তৈরি হয়। মানবদেহের কোথাও টিউমার হলে বা গ্রন্থি তৈরি হলে ন্যানো জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসাতেও কাজে লাগে। দিন যত এগোচ্ছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির বিভিন্ন পরীক্ষা ন্যানোপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

গবেষণের এই ধাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ন্যানোসেন্সর তৈরি করা। মূল কাজ হলো জৈব, রাসায়নিক বা শল্য চিকিৎসায় ন্যানোপ্রযুক্তির আদান-প্রদানে সাহায্য করা। তবে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে ন্যানোসেন্সর তৈরি করতে না পারলেও জানিয়েছেন, পরীক্ষার কোনো এক ধাপে ন্যানোসেন্সর তৈরি হয়। চিকিৎসকেরা ইনজেকশন দেওয়ার সময় ক্যাডমিয়াম সেলেনাইড কোয়ান্টাম ডটস ব্যবহার করেন। এটি শরীরেও ঢুকে ঠিক কোথায় টিউমার আছে, তা চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে।

ন্যানোপ্রযুক্তির প্রাণপুরুষ যাঁরা

নরিও তানিগুসি : ১৯১২ সালের ২৭ মে জন্মগ্রহণ করা এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই সর্বপ্রথম 'ন্যানোটেকনোলজি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি টোকিও সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষক ছিলেন। তাঁর মতে, ন্যানোপ্রযুক্তি হলো একটি অণু বা একটি পরমাণুর মাধ্যমে কোনো বস্তুর আণবিক অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ নিজস্ব পরিবর্তন। তাঁর এই ভাবনার উপর ভিত্তি করেই তিনি দৃঢ় এবং ভঙ্গুর জিনিসের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। পেলেন সাফল্যও। মাইক্রোওয়েভ, ইলেকট্রন বিম, আয়ন বিম, ফোটন লেসার ইত্যাদিতে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার তাঁরই আবিষ্কার।

রিচার্ড ফিলিপস ফেইনম্যান : ১৯১৮ সালের ১১ মে জন্মগ্রহণ করা এই বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম ইলেকট্রো ডায়নামিক্স নিয়ে গবেষণায় উপরের সারিতে। ১৯৬৫ সালে মার্কিন এই বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য জুলিয়াস সোয়ার্তজউইঙ্গার এবং সিনইতিরো তমোনাগার সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৫৯ সালে পদার্থবিদ্যায় জনপ্রিয়তার জন্য ফেইনম্যান যেসব বই লিখেছিলেন বা ভাষণ দিয়েছেন, তাতেই তিনি প্রথম টপ-ডাউন ন্যানোটেকনোলজির উল্লেখ করেছেন। পদার্থবিদ্যায় প্রাথমিক কণার উপরও তিনি কাজ করেছেন। ফেইনম্যানকে কোয়ান্টাম গণনা এবং ন্যানোটেকনোলজির জনক হিসেবে গণ্য করা হয়।

রিচার্ড ফিলিপস ফেইনম্যান

কিম এরিক ড্রেক্সলার

কিম এরিক ড্রেক্সলার : জন্ম ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ডে। আণবিক ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে গবেষণায় একেবারে প্রথম সারিতে অবস্থান তাঁর। ১৯৯১ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে তাঁর ডক্টরেট থিসিসটি *Nanosystems Molecular Machinary Manufacturing and Computation* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ড্রেক্সলারের মতে, আণবিক ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে জটিলতম ধাপটি হলো প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ডিজাইন এবং যন্ত্রটি তৈরি।

সুমিও লিজিমা : ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করা জাপানের এই বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী কার্বন ন্যানোটিউব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। ১৯৯১ সালে কার্বন ন্যানো গঠনের উপর তাঁর পেপারটি যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে তিনি অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেলাসাকার পদার্থ ও তার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কপি নিয়ে গবেষণা করেন। ২০০২ সালে পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার পান। এখন তিনি এস কে কে অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ ন্যানোটেকনোলজির ডিরেক্টর।

আন্দ্রে জেইম : ইনি গ্রাফিন আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত গ্রাফিন নতুন ধরনের অণু তৈরির জন্যে ২০০৭ সালে দ্য ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স মনোনীত ও স্বীকৃত হয়েছেন। এখন তিনি ম্যানচেস্টার সেন্টার ফর মেসোসায়েন্স অ্যান্ড ন্যানোটেকনোলজি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত।

রবার্ট কার্ল : ফুলারেন্সের আবিষ্কারের জন্য ১৯৯৬ সালে স্যার হ্যারল্ড ক্রোটো এবং রিচার্ড স্ম্যালের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপক।

জেমস গিমজেওস্কি : স্ক্যানিংটানেলিং মাইক্রোস্কপি ব্যবহার করে আলো নিঃসরণ এবং একটি অণুর সঙ্গে তড়িৎ সংযোগের বিষয় গবেষণা করে বিখ্যাত।

স্যার হ্যারল্ড ক্রোটো : রসায়নে গবেষণার জন্য ১৯৯৬ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এর আগে ১৯৯১ সালে রয়্যাল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির সদস্য হন। কার্বনের নতুন রূপ C_{60} আবিষ্কারের জন্য রবার্ট কার্ল ও রিচার্ড স্ম্যালের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান।

জর্জ হোয়াইট সাইডস : জৈব রসায়ন ও ভৌত জৈব রসায়নসহ বস্তুবিজ্ঞান ও অণুঘটনের উপর গবেষণা করে বিখ্যাত। এছাড়াও নানা দেশে বহু বিজ্ঞানী আজ ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে গবেষণায় ডুবে আছেন।

সুগন্ধি কিংবা খাবারে ন্যানো

বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কিন্তু আজ এটাই বাস্তব। সুগন্ধী কিংবা খাবারে এখন ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন– অনেক ওষুধ, সুগন্ধি বা মিষ্টান্ন জাতীয় খাবারে দেখা যায়, বাতাসের সংস্পর্শে এলেই হয় শুকিয়ে যায় কিংবা কিছু থিতিয়ে পড়ে। রঙেরও পরিবর্তন হয় কখনো। এগুলো এড়াতেই বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহারে ন্যানোস্কেল কাজে লাগানো হয়।

ভিটামিন বা খনিজ পদার্থের সামান্য মাত্রা পরিবর্তনেও ব্যবহার হয় ন্যানোপ্রযুক্তি। খাবারে যাতে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে না পড়ে, প্যাকিং করা খাবার যাতে দীর্ঘদিন থাকলেও টক্সিক না হয়ে পড়ে–সেজন্য আজকাল প্রত্যেকটি কোম্পানি ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার করছে। স্বাদ বাড়াতেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ন্যানোপ্রযুক্তির।

ন্যানোরোবট

ন্যানোপ্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার অন্যতম শিরোনামে ন্যানোরোবট। নামে রোবট হলেও এর হাত-পা-নাক-কান-চোখ বলে কিছুই নেই। শুধুই চিপ জাতীয় বস্তু। আর ন্যানো বলে এর আকার ০.৫–৩ মাইক্রোমিটারের মধ্যবর্তী। কীভাবে কাজ করে এই ন্যানোরোবট?

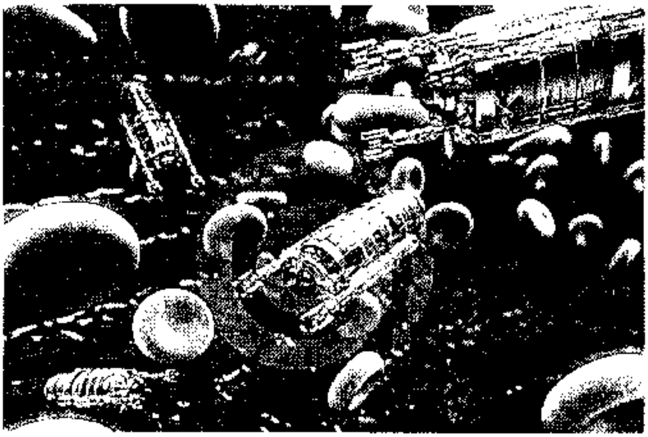

ন্যানো রোবট

ইন্সটিটিউট অব মলিকিউলার ম্যানুফ্যাকচারিং-এর রবার্ট ফ্রেটাসের মতে, অন্য জায়গায় অল্পবিস্তর ব্যবহার হলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানেই এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। মূলত কার্বন বা এর রূপভেদ থেকেই ন্যানোরোবট তৈরি হয়। এর আকার ০.৫–৩ মাইক্রোমিটারের মতো। কার্বন-১৩ নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কার্বন-১২ থেকে বেশি বলে এই কার্বনই ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট কোনো কোষে রোগ হয়েছে, তাকে লক্ষ করে ন্যানোরোবটের চিপ রক্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নজর রাখা হয় ন্যানো কম্পিউটারের মাধ্যমে। অনেক সময় শল্য চিকিৎসায়ও ন্যানোরোবট ব্যবহৃত হয়েছে। এটি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার পর ঠিক যেখানে টিউমার হয়েছে বা গ্রন্থি ফুলে উঠেছে, সেই জায়গাটি নির্দেশ করতে থাকে। কখনও কখনও আণবিক স্তরে কোনো কোষের অণুজীবের মেরামতের কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়। ভাবনা আসতেই পারে, কোষীয় মেরামতির সময় তো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াও ঢুকে যেতে পারে। ঘটতে পারে হিতে বিপরীত ঘটনা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ন্যানোরোবটের গঠন ভীষণ জটিল। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কোষে পৌঁছে কোষীয় পর্দা সরিয়ে এটি ভেতরে ঢুকে পড়ে। অন্য কিছু ঢোকে না। বন্দিগ্রস্ত ডিএনএ বা উৎসেচক উৎপাদক অজাণুকে সারিয়ে তোলে।

কার্বন ন্যানোটিউব

ইলেকট্রনিক, তাপীয় এবং গঠনগত দিক থেকে কার্বন ন্যানোটিউবই হলো এই শতকের আধুনিকতম উপাদান। পদার্থ বললেও ভুল হয় না। তাপ ও তড়িৎ পরিবহনে তামার থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির যে কোনো সার্কিটই তৈরি হচ্ছে কার্বন ন্যানোটিউব দিয়ে। আবার তাপীয় পরিবহনে হীরার সমতুল্য। কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কিংবা পামটপের সার্কিট এই ন্যানোটিউব দিয়েই তৈরি হচ্ছে। ইস্পাতের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি শক্ত। আবার ওজন তুলনায় এক ষষ্ঠাংশ।

কার্বন ন্যানোটিউবের এই গুণগুলোকেই এখন কাজে লাগাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। 'সিঙ্গল ওয়াল্ড' ন্যানোটিউব থেকে 'মাল্টি ওয়ালড' ন্যানোটিউব তৈরি হচ্ছে। একের পর এক 'হার্ডল' পেরিয়ে বাজারেও আসছে বিভিন্ন জিনিস। প্রতিরক্ষা দপ্তরের যাবতীয় যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে এরোস্পেস, এরোক্রাফট কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি তৈরিতেও এখন কার্বন ন্যানোটিউবের সঙ্গে প্লাস্টিক ও সুতা মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, ভাবা যায়, লন টেনিসের র‍্যাকেটেও নাকি কার্বন ন্যানোটিউবই ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ, যত দিন যাচ্ছে, এই খেলার বলের গতি বাড়ছে। প্রয়োজন বেশি সহনক্ষম র‍্যাকেট। তাই এই উদ্যোগ। স্টুগার্টের ফ্রনহফার টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, অতিরিক্ত হালকা ও তাপ পরিবহনের ক্ষমতার জন্যই ন্যানোটিউবের এত চাহিদা।

ন্যানোমোটর

শক্তিকে চলন বা কাজে রূপান্তরিত করতে ন্যানোমোটর ব্যবহার করা হয়। জীবন্ত কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ায় যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাকে ন্যানোমোটরের সাহায্যে কাজে রূপান্তরিত করা হয়। জীববিজ্ঞানীদের মতে, কোষের মাইক্রোটিবিউলের মধ্যে কাইনেসিন যেভাবে কাজ করে, ঠিক সেভাবেই ন্যানোমোটর শক্তির পরিবর্তন ঘটায়

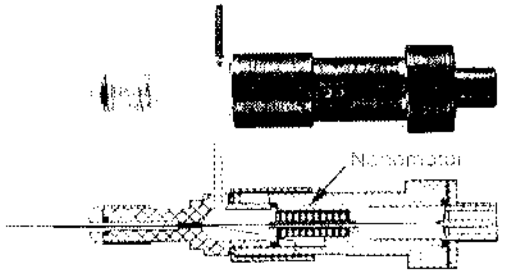

ন্যানোমোটর

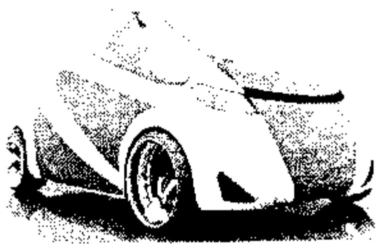

ন্যানো গাড়ি

পরিবেশ ও ন্যানোপ্রযুক্তি

পরিবেশ দূষণ কমাতে এবং সূর্যের আলো থেকে পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তি উৎপন্ন করতে আজকের দিনে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত এবং হচ্ছেও। কারণ উন্নত বা উন্নয়নশীল যে দেশই হোক না কেন, জনস্ফীতির জন্য পৃথিবীর উপর যেভাবে চাপ বাড়ছে, তাতে ন্যানোটেকনোলজি নির্ভর না হওয়া ছাড়া আমাদের আর গতি নেই।

গত কয়েক বছর আগে আমেরিকান অর্থনীতিবিদ জিওফ্রে ম্যাক্স বিবিসি-তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে ন্যানোপ্রযুক্তির অগ্রগতির উপর। এর ভালো এবং মন্দ দুটো দিক আছে। আসলে আমরা এমন একটা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যেখানে প্রত্যেকটি জিনিস অন্য জিনিসের সঙ্গে চেইনের মতো যুক্ত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ। কয়েক হাত দূরে দোকানে যেতেও গাড়ি ব্যবহার করি, যে সময় যে ফল বা শাকসবজি পাওয়া সম্ভব নয়–তা পেতে চাই। আর আমাদের এই চাহিদা প্রত্যেক দিনই তো বাড়ছে। তাই ন্যানোপ্রযুক্তির হাতে ধরা ছাড়া গতি নেই। অন্যদিকে গাছ কাটা বন্ধ করে সূর্যের আলো থেকে ঘরে ঘরে ছোট ছোট সৌর আলো ব্যবহার করার উপরই জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, যাতে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি থেকে অতিপরিবাহী– সর্বত্রই ন্যানোপ্রযুক্তির দাপাদাপি। আসলে আফ্রিকা বা এশিয়ার কিছু দেশ রয়েছে, যারা সত্যিই এখনও আর্থিকভাবে ভীষণ পিছিয়ে। হয়তো লণ্ঠনের আলো যোগাতেও কষ্ট হয়। তাদের ক্ষেত্রে ন্যানোপ্রযুক্তি নির্ভর এই যন্ত্রপাতি সত্যিই জীবনধারাকে পাল্টে দেবে। অন্যদিকে গাড়িতে রং করার সময় ভারী ধাতু ক্যাডমিয়াম ও ক্রোমিয়ামের ন্যানোকণা বাতাসে মিশছে। মূলত এই দুই ভারী ধাতু থেকে দূষণ শূন্যে নামিয়ে আনতে লড়াই চালাচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এই রংগুলো একদিকে যেমন ভীষণ দামি, অন্যদিকে পরিবেশেরও ক্ষতি করে। ন্যানো কোডিং-এর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধোঁয়ায় কিছু বিষাক্ত ন্যানোকণা থেকেই যাচ্ছে। এগুলো আটকাতে এখন ন্যানোসেন্সর ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ দূষণই যদি মাপা না গেল, তা কমবে কীভাবে! আর কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগে অনলাইনেই দূষণ মাপা ভীষণ জরুরি। বিজ্ঞানীরা তাই নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন, ন্যানোপ্রযুক্তির আধুনিকতম ব্যবহার ঘটিয়ে কীভাবে ন্যানোসেন্সরের দাম কমানো যায়, ব্যবহার বাড়ানো যায়

ন্যানোপ্রযুক্তি থেকে বিপদ

বিপদ একেবারেই নেই বলে উড়িয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। বিশেষ করে ন্যানোপ্রযুক্তির গবেষকরা যখন ন্যানোটক্সিসিটির উল্লেখ করছেন। সেন্টার ফর রেসপনসিবল ন্যানোটেকনোলজির গবেষকরা ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহারে সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করছেন। অন্যদিকে উমে উইলসন সেন্টারস প্রজেক্ট অন ইমার্জিং টেকনোলজিস-এর ডিরেক্টর ডেভিড রাজেস্কির মতে, কোনো সংস্থা বা সংগঠন কতটা প্রযুক্তি কোন কাজে ব্যবহার করছে তার উপর সরকারি নজরদারি রাখতে হবে। তা সে বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প বা গাড়ি, অ্যারোপ্লেন, মোবাইল ফোন– যাই হোক না কেন!

সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ নামে একটি সংস্থা মানুষের দেহে ন্যানোকণার প্রভাব নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সেটাও জানিয়েছে তারা। দেখা যাচ্ছে, ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার যেসব কারখানায় হচ্ছে, সেখানে কিছুটা হলেও কর্মীরা অসুস্থ হচ্ছেন

উপসংহার

ন্যানোপ্রযুক্তি কিংবা ন্যানোপ্রযুক্তি কেন? আরও একটু ছোট করে শুধু ন্যানোকে নিয়ে বলা যায়, স্বপ্নের মাপ ছোট হলেও তাৎপর্যের নিক্তিতে পরিমাপ করলেও তা যে ছোট হবে– এমন তো কথা নেই। বরং বিজ্ঞানের ইতিহাস বলছে, অনেক স্বপ্ন আপাত ছোট হলেও তা সময় ও সমকালকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। অন্যদিকে ন্যানোপ্রযুক্তি গাড়ি শিল্প তো বটেই, ভারী ও হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পেট্রো রসায়ন, ওষুধ এবং সর্বোপরি গবেষণার সর্বস্তরে ন্যানোপ্রযুক্তির হাত ধরে চলা ছাড়া আগামী দিনে আর বোধহয় অন্য কিছুই সম্ভব নয়।

★ *প্রবন্ধকার একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও গ্রন্থকার এবং প্রাগ্রসর বিজ্ঞানাগার, খুলনার সাধারণ সম্পাদক।*

টেকসই কৃষি : আমাদের প্রত্যাশা

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

শিরোনামই বলে দিচ্ছে যে, আমাদের বর্তমান কৃষি ঠিক টেকসই নয়। আমরা আমাদের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার প্রেক্ষাপটে এক জমিতে বছরে দুই ফসল, তিন ফসল আবার ক্ষেত্রভেদে চার ফসল আবাদ করছি। এ রকম আবাদ সম্ভব হচ্ছে, কারণ আমরা ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে ফসল আবাদের জন্য পানি সেচের ব্যবহার অনেক স্থানেই নিশ্চিত করেছি। আমরা মাটির উর্বরা শক্তি কমে যাওয়ায় প্রতিটি ফসল আবাদের সময় অজৈব রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি। পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য আমরা রাসায়নিক নানা রকম বালাইনাশক দ্রব্য ব্যবহার করছি। আগাছা নির্মূলের জন্য আমরা দিন দিন আগাছানাশক প্রয়োগ করে চলেছি। শাকসবজি আর ফলমূল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকম গ্রোথ রেগুলেটর। ফল পাকানোর জন্য এবং ফলের পচন রোধের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ। আমরা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ফসল ফলাবার জন্য ফসলের সমরূপ উচ্চ ফলনশীল উচ্চ মাত্রার উপকরণ সংবেদী জাত ব্যবহার করছি। আমরা জীববৈচিত্র্যময় কৃষির বদলে বৈচিত্র্যহীন কৃষি কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হয়ে উঠেছি। আপাতত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই যে আমাদের নানা কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে দেশে তা একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব নয় অন্যদিকে তেমনি তা টেকসইও নয়।

আমাদের চলমান কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের বাস্তুতন্ত্র কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটি মাথায় রেখে তবে আমাদের টেকসই কৃষির দিকে এগোতে হবে। আমাদের আবাদি জমি আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। এর জৈব বস্তুর পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করে চলেছে। অনেক আবাদি জমিতে জৈব বস্তুর পরিমাণ শতকরা এক ভাগে নেমে এসেছে। মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গঠন অনেক স্থানে নেতিবাচকভাবে পাল্টে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে পানি দিন দিন অধিক গভীরতায় চলে যাচ্ছে অর্থাৎ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক জ্বালানির খরচও দিন দিন বেড়ে চলেছে। মাটিতে জৈববস্তু প্রয়োগ না করে বেশি বেশি রাসায়নিক সার প্রয়োগ মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। নানা রকম বালাইনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি আমাদের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। জল-বায়ু-পানি সর্বত্রই এর প্রভাব পড়েছে। জীববৈচিত্র্যময় কৃষিকে বর্জন করে আমরা জীববৈচিত্র্যহীন উচ্চ ফলনশীল সমরূপ জাত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, আর সে কারণে দিন দিন হারাচ্ছি আমাদের বৈচিত্র্যময় জিন সম্পদ। রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ছে সে কারণে। অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিটাকে দিন দিন সংকোচিত করে চলেছি। সে কারণেই আজ টেকসই কৃষির কথা উঠে আসছে।

নানা রকম পরিবেশিক ধাত যেমন বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা আমাদের ফসলের উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করছে। আমাদের ১.২৩ এবং ৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি যথাক্রমে তীব্র এবং মাঝারি বন্যা প্রবণ। খরিপ ঋতুতে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন হেক্টর এবং শুষ্ক মৌসুমে ১.২ মিলিয়ন হেক্টর জমি খরার কবলে পড়ে। আবার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১ মিলিয়ন হেক্টর জমি নানা মাত্রার লবণাক্ততার শিকার। ফলে এসব পরিবেশিক ধাত ফসলের উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। এর উপর রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের অভিঘাত। অধিক তাপমাত্রার সাথে অল্প বৃষ্টিপাত বা বৃষ্টিপাতহীনতা যুক্ত হয়ে বাড়ছে খরা আর হ্রাস করছে ফসলের ফলন।

প্রতিটি ফসলের গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। যদি ধান চাষের কথা ধরি তাহলে দেখা যাবে যে, চাষের জন্য ব্যবহৃত সিংহভাগ বীজই আসছে কৃষকের নিজের সংরক্ষণ করা বীজ থেকে। এদের গুণমান কখনোই উত্তম নয়। উত্তম বীজ উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমাদের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা আমাদের কৃষির একটি বড় নিয়ামক। অথচ তাদের কাছে আমাদের উদ্ভাবিত বহু প্রযুক্তি আজও পৌঁছেনি। না পরিবেশ-প্রতিবেশ অনুযায়ী উদ্ভাবিত জাত, না উৎপাদন প্রযুক্তি।

টেকসই কৃষির জন্য আমাদের কৃষি সম্পদের ভিত্তিটাকে রক্ষার উদ্যোগ নেবার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের মাটির স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার জন্য মাটিতে জৈব বস্তু প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সারের আজ ঘাটতি হয়েছে গো পালন হ্রাস পাওয়ায়। গৃহপালন হ্রাস পাওয়ায় হাঁস-মুরগির বিষ্টাও আজ নেই কৃষকের বাড়িতে আজ। তাই বিকল্প জৈব সারের ব্যবহার আমাদের বাড়াতে হবে। কেঁচো চাষ করে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করে আজ মাঠে প্রয়োগ করছেন কিছু কিছু চাষি। এর ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে। তাছাড়া নানা রকম কৃষিজ জৈব বস্তুকে এক গর্তে সংরক্ষণ করে তাদের জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। আমাদের জমিতে এখন অভাব ঘটছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম ছাড়াও অন্য আরও মুখ্য খাদ্য উপাদানেরও। তাছাড়া অনেক আবাদি জমিতে এখন খনিজ অণুপুষ্টির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের গাইড লাইন অনুসরণ করে মাটিতে এখন অণুপুষ্টি সার যথা: জিঙ্ক, বোরন ইত্যাদি সার প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করে মাটির স্বাস্থ্য এবং মাটিতে পুষ্টি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

টেকসই ফসল উৎপাদনের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। বীজের বংশগত বৈশিষ্ট্য আর স্বাস্থ্যগত মান রক্ষা করে কৃষকের নিকট বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান-বিএডিসির সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাইভেট বীজ কোম্পানিকে উপযুক্ত সরকারি সহায়তা প্রদান করতে হবে উত্তম বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই। এখনও চাষের কাজে ব্যবহৃত শতকরা ৮০–৯০ ভাগ বীজ কৃষকের নিজের সংরক্ষিত বীজ। এদের গুণমান কখনোই উত্তম নয়। বীজ উৎপাদন, শুকানো, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য কৃষককে অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে গুণগত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উত্তম বীজ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে ফসলের উৎপাদন বাড়তে বাধ্য।

টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কৃষির আরেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড। বর্তমানে আমাদের দেশে পানি ব্যবহারের দক্ষতা মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। সময়মতো ও পরিমিত মাত্রায় পানি সেচ দেওয়া পানি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৃষ্টির পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং বর্ষাকালে নালা, গর্ত, পুকুর এসব স্থানে বর্ষার পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ অনেকটাই কাটিয়ে উঠা যায়। ডিজেল এবং বিদ্যুতের বাড়তি দামের জন্য বাংলাদেশে সেচের খরচ বেড়ে যায়। সেচ ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সেচের জন্য ব্যবহৃত ডিজেলের জন্য কৃষককে ভর্তুকি প্রদান করা যায়।

বাংলাদেশের কৃষির প্রাণ হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। এদেশের কৃষির শতকরা ৮৫ ভাগই হলেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। কৃষির এক বড় নিয়ামক শক্তি হলেন তারা। তাদের কাছে কৃষির সঠিক প্রযুক্তি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ পৌছালেই আমাদের কৃষিতে সত্যিকার গতি সঞ্চারিত হবে। সামর্থ্যের অভাবে এবং প্রযুক্তি প্রসারে আমরা শতভাগ দক্ষ হয়ে উঠিনি বলে কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তাঁদের অবদান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ফলে এদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছানো এক অতি জরুরি বিষয়। তাছাড়া স্বল্প সুদে সহজ শর্তে তাদের হাতে ঋণ পৌঁছে দিতে পারলে তা অবশ্যই কৃষিতে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কৃষকের উৎপাদিত পচনশীল পণ্য সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে এবং কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে কৃষি থেকে আয় বাড়বে নিঃসন্দেহে।

আমাদের মাটির স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের ফসলি বাস্তুতন্ত্রকে সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ কমাতে হবে। বাড়াতে হবে জৈব ও জীবজ কীটনাশকের ব্যবহার। তাছাড়া সমন্বিত পোকামাকড় দমন কৌশল অবলম্বন করে মাটি, বায়ু ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এর জন্য সমন্বিত পোকামাকড় দমন কৌশল জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে আমাদের কৃষককে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম; একটুখানি প্রশিক্ষণ আর প্রণোদনা এ কাজে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনেক সহায়ক হবে। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফসল আবাদ করা গেলে এমনিতে হ্রাস পাবে পোকামাকড়ের আক্রমণ। হ্রাস পাবে রোগবালাইও। সে ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক এবং ব্যাকটেরিয়ানাশক পদার্থ প্রয়োগ খানিকটা হ্রাস পেতে পারে। শুধু সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ফসলের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত হলে যে কীটপতঙ্গের আক্রমণ হ্রাস পায়, তা এখন ভালোভাবেই প্রমাণিত।

পরিবেশিক ঘাত মোকাবেলা করার জন্য আমাদের উদ্ভাবন করতে হচ্ছে ঘাত সহনশীল ফসলের জাত। ধান ছাড়া অন্য কোনো ফসলে নির্দিষ্ট ঘাত সহনশীল জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড আমরা এখনও শুরু করতে পারিনি। ধানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ছয়-সাতটি নানা মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল জাত বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। দু'সপ্তাহ ধানের চারা আকস্মিক বন্যা সইতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন একাধিক জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। খরা সহনশীল একাধিক জাতও অবমুক্ত করেছেন ব্রি বিজ্ঞানীরা। গমের ক্ষেত্রেও উষ্ণতা সহনশীল একাধিক গম জাত কৃষকের নিকট অবমুক্ত করেছেন বারি বিজ্ঞানীরা। আরও বেশি গবেষণা করা গেলে আরও ঘাত সহনশীল জাত বাছাই বা উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে।

আমাদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ, আর প্রধান সমস্যা দুটি। সমস্যা একটি এই যে, আমাদের জনগণকে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে আমাদের কম জমিতে ফলাতে হবে অধিক ফসল। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো আমাদের তা করতে হবে আমাদের কৃষি সম্পদ ভিত্তিটাকে ক্ষতি না করে। কৃষকের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজ পণ্য বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকের প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এমনিতর নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে কৃষিকে টেকসই করা যেতে পারে। আমাদের আবাদি জমির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষা, আমাদের সেচের পানি সরবরাহ ও এর গুণাগুণ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আবাদ কৌশল অনুসরণসহ ঘাত সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও এদের প্রসার এবং ফসলের দক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা কৌশল অবলম্বন করেই কেবল টেকসই কৃষি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব। ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা, কর্মোদ্যোগ ও সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারলেই কেবল আমাদের কৃষি হবে প্রকৃতি বান্ধব, হবে অবশ্যই টেকসই।

★ *প্রবন্ধকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগের প্রফেসর এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর।*

নিরাপদ ফল উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি

ড. মোঃ শরফ উদ্দিন

গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার উদ্ভাবন হলো ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি। এই প্রযুক্তিটি বাংলাদেশে একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। যে সময়ে আমরা চিন্তিত ও আতঙ্কিত ছিলাম ফল বাগানে বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে এ সময়েই আমবিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করলেন নতুন এই প্রযুক্তির, যা শুধু সাশ্রয়ীই নয় পরিবেশবান্ধবও বটে। চলতি মৌসুমে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ আটটি জেলায় বাণিজ্যিকভাবে প্রযুক্তিটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এখন আমরা জানব ফ্রুট ব্যাগিং সম্পর্কে। ফ্রুট ব্যাগিং বলতে ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিশেষ ধরনের ব্যাগ দ্বারা ফলকে আবৃত করাকে বুঝায় এবং এরপর থেকে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত গাছেই লাগানো থাকবে ব্যাগটি। এই ব্যাগ বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন রং এবং আকারের হয়ে থাকে। তবে আমের জন্য দুই ধরনের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঙিন আমের জন্য সাদা রঙের ব্যাগ এবং অন্য সকল আমের জন্য দুই আস্তরের বাদামি ব্যাগ।

আমাদের দেশে যেসব ফলগুলো সহজেই ব্যাগিং-এর আওতায় এনে সুফল পাওয়া সম্ভব সেগুলো হলো আম, পেয়ারা, ডালিম, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত ফলসমূহ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানি উপযোগী

ব্যাগিং করার উপযুক্ত সময়

প্রত্যেক ফলের জন্য ব্যাগিং করার সময় ভিন্ন ধরনের। যেমন আমের ক্ষেত্রে ব্যাগিং করা হয় ৪০–৫৫ দিন বয়সে। এই সময়ে আম জাতভেদে মটরদানা থেকে মার্বেল আকারের হয়ে থাকে। তবে ফজলি, হাড়িভাঙ্গা এবং আশ্বিনা আমের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৬৫ দিন হলেও ব্যাগিং করা যাবে। পেয়ারার ক্ষেত্রে ব্যাগিং করা হয় ৫০–৫৫ দিন বয়সে এবং ডালিমের ক্ষেত্রে ২০–২৫ দিন বয়সে। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ভালোভাবে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা ঠিক নয়। আমের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি স্প্রে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন প্রথমবার আম গাছে মুকুল আসার আনুমানিক ১৫–২০ দিন পূর্বে, দ্বিতীয়বার মুকুল আসার পর অর্থাৎ আমের মুকুল যখন ১০–১৫ সেমি লম্বা হবে কিন্তু ফুল ফুটবে না এবং আম যখন মটর দানার মতো হবে তখন একবার। তবে এর পরপরই আমে স্প্রে করে ব্যাগিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাগিং করার পূর্বেই মরা মুকুল বা পুষ্পমঞ্জরির অংশবিশেষ, পত্র, উপপত্র অথবা এমন কিছু যা ফলের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু আগে থেকেই বাণিজ্যিকভাবে ফল উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যে সকল আম রপ্তানিকারক দেশ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আম রপ্তানি করছে তারা এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে আমের উৎপাদন করে থাকে।

বাংলাদেশেও এই বহুল পরিচিত প্রযুক্তিটি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে, ফলাফলও ছিল ভালো। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে শুরু করা হয়নি বিগত পাঁচটি বছর। অবশেষে ২০১৪ সালে চীনা একটি কোম্পানি বিভিন্নভাবে গবেষণা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে এবং আম, পেয়ারা, ডালিম, লিচু, কলার উপর গবেষণা সম্পন্ন করা হয়।

এই ফলগুলো সবটিতেই আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়। চলতি মৌসুমে আমে ও পেয়ারায় চাষি পর্যায়ে ব্যাপক আগ্রহের সাথে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে আম চাষাবাদের জন্য ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সফল ও সম্ভাবনাময়। চলতি মৌসুমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, গোপালগঞ্জ, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বাণিজ্যিকভাবে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এই জেলাগুলোতে ৩ লাখ ৮০ হাজার আমে ব্যাগিং করা হয়েছে এবং এই প্রযুক্তিতে উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ২৫০ মেট্রিক টন।

যে সকল এলাকায় আম বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয় না বা শুধুমাত্র পারিবারিক চাহিদা পূরণে আমগাছ লাগানো হয়েছে এবং এসব গাছে সময়মতো স্প্রে করা হয় না বা সেই ধরনের প্রচলন এখনও এলাকায় চালু হয়নি। ফলে প্রতি বছরই তাদের গাছে আম ধরে। কিন্তু পোকা ও রোগের কারণে অধিকাংশ আম নষ্ট হয়ে যায়। এসব আমগাছে এই প্রযুক্তিটি সবচেয়ে কার্যকর। এছাড়াও যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং আম দেরিতে পাকে সে সকল আমের জাতগুলো বিবর্ণ বা কালো রং ধারণ করতে দেখা যায় এবং মাছি

পোকার আক্রমণ দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাবীজাত আশ্বিনাতে ১০০ ভাগ আমের মাছি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। যেসব বাগানে ঘন করে আম লাগানো হয়েছে এবং বর্তমানে গাছের ভেতরে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সে সকল গাছে আমের মাছি পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। এছাড়াও পাহাড়ি জেলাগুলোতে ফলে মাছি পোকার আক্রমণে প্রায় শতভাগ আম, পেয়ারাসহ অন্যান্য ফল নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ যেসব জায়গায় আম উৎপাদনে সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশি সেসব জায়গায় ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শতভাগ ফল সংগ্রহ করা যায়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রচলিত আছে কোনোটিতেই এই ফ্রুট ফ্লাই শতভাগ দমন করা সম্ভব নয়; বরং আক্রমণের হার কিছুটা কমিয়ে রাখা যায়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শতভাগ রোগ ও পোকামাকড় দমন করা যায়। আম রপ্তানির জন্য ভালো মানসম্পন্ন, রঙিন, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণমুক্ত আম প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন আম রপ্তানিকারক দেশে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে কম পরিমাণে বালাইনাশক ব্যবহার করে ১০০% রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত আম উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়াও ব্যাগিং করা আম সংগ্রহের পর ১০–১৪ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। সেই সাথে রঙিন, ভালো মানসম্পন্ন নিরাপদ আমও পাওয়া যায়। এদেশের মানুষ কার্বাইড, ফরমালিন আতঙ্কে যখন দেশীয় মৌসুমি ফল খাওয়া থেকে প্রায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে সময়েই এই প্রযুক্তিটি মানুষের হাতের নাগালে। যেকোনো আম চাষি, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ ইচ্ছে করলেই এই প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে সুফল পেতে পারেন। অন্যদিকে খরচ কমানো যাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার। প্রতিবছর কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের আমদানি বাবদ খরচ করতে হয় কোটি কোটি ডলার এবং ব্যবহার করা হয় অপকারী পোকাকে মারার জন্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপকারী ও বন্ধুপোকাগুলোও মারা যায়। ফলে দেখা দিয়েছে পরাগায়নকারী পোকার ঘাটতি। পর্যাপ্ত ফল ধারণ হচ্ছে না অনেক পরপরাগী ফলের। বর্তমান সময়ে আম বাগানে স্প্রের পরিমাণ লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমবাগানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে ১৫-৬২ বার স্প্রে। অথচ ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হলে ৭০–৯০ ভাগ স্প্রে খরচ কমানো সম্ভব। এই প্রযুক্তিটি ফলচাষিদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলে সারাদেশেই উৎপাদিত হবে নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য ফল।

ব্যাগিং প্রযুক্তি হতে ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে; নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাগিং করতে হবে। ব্যাগিং করার পূর্বে আমগুলোকে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে (বিকেল বেলায় ব্যাগিং করতে চাইলে সকাল বেলায় স্প্রে করতে হবে অথবা ব্যাগিং করার কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা পূর্বে স্প্রে করতে হবে তবে স্প্রে করার পরের দিনও ব্যাগিং করা যাবে যদি বৃষ্টিপাত না হয়)। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা উচিত নয়।

ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহারে বেশি লাভবান হয়েছেন আশ্বিনা জাতের আমচাষিরা। ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত আম সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বিষমুক্ত এবং পুরোটাই রপ্তানিযোগ্য। এই আমগুলো বিক্রি করার জন্য আড়তে যেতে হচ্ছে না আমচাষিদের। মৌসুমের প্রথম দিকে চাঁপাই এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাগান থেকে সরাসরি ৩২০০ টাকা মণ দরে খিরসাপাত, ল্যাংড়া ও আম্রপালি জাতের আম ক্রয় করছেন। অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি করছেন বাগান থেকেই। এছাড়াও সোনার মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জে মেসার্স বারকুল্লাহ ট্রেডার্স ৮০ টাকা কেজি দরে গোপালভোগ, খিরসাপাত/হিমসাগর, ল্যাংড়া জাতের আম ক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আম কিনেছে। এখানে যে কোনো পরিমাণ ব্যাগিং আম কেনা হয়েছে। আমচাষিরা এবং বাগান মালিকেরা জেনে আনন্দিত হবেন, এবার আশ্বিনা আম মৌসুমের শুরুতে বিক্রি হয়েছিল ৫৫০০ টাকা মণ দরে। যেখানে সাধারণ আম বিক্রি হচ্ছে ২০০০–২৫০০ টাকা মণ দরে। এর পর থেকে দাম বাড়ছেই।

সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আশ্বিনা আমে ব্যাগিং করেছিলেন শিবগঞ্জ উপজেলার লাউঘাটা গ্রামের আমচাষি মজিবর ও সাদিকুল। ব্যাগিং যখন শুরু করেছিল মজিবর তখন অনেকে তাকে পাগল উপাধি দিয়েছিল। সেই মজিবরই শেষ পর্যন্ত হিরো বনে গেছেন। সবাইকে তাক লাগিয়ে ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত আম কানসাট বাজারে বিক্রি করেছেন বিভিন্ন দামে। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিক্রি করেছেন ১১০০০-১২০০০ টাকা মণ দরে। আমগুলো কিনেছেন ঢাকার আম ব্যবসায়ীরা। কোনো আমচাষি কি কখনও ভেবে দেখেছিলেন যে আশ্বিনা আম কানসাট বাজারে এত দামে বিক্রি করবেন। এই সময় পর্যন্ত ব্যাগিং ছাড়া আমে বালাইনাশক স্প্রে করতে হতো ৩৫-৪০ বার। যেখানে ব্যাগিং প্রযুক্তিতে করতে হয় মাত্র সাড়ে তিনবার। ব্যাগিং ছাড়া আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আম বিক্রি করার বেশিরভাগ টাকাই চলে যাচ্ছে বালাইনাশকের দাম পরিশোধ করতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম বছরে যে যতটুকু পরিমাণ ব্যাগিং আম উৎপাদন করেছেন তার বিক্রি করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

উপসংহার

ফ্রুট প্রোটেকটিং পেপার ব্যাগ নিয়ে গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃষিবিদ জনাব রুহিদাস জোয়ার্দার, উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উনার প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্যই মূলত এই পরিবেশবান্ধব ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ব্যাগিং প্রযুক্তিটি মাঠ পর্যায়ে সফল হওয়ার এর দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দাতা সংগঠন, আম ফাউন্ডেশন তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আশা করি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাপদ ও বিষমুক্ত আম সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য হবে দেশের সকল মানুষের জন্য। দেশের আম রপ্তানি হোক বিদেশের নামিদামি মার্কেটে। আম রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করে দেশীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে তবেই দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। পরিশেষে, নিরাপদ ও বিষমুক্ত আম সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য হোক সকল মানুষের জন্য সকল মানুষের জন্য এই প্রত্যাশাই ফল গবেষকদের।

★ *প্রবন্ধকার আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।*

স্মৃতিশক্তির নানা কথা

মোঃ নজরুল ইসলাম

মানুষকে সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সাথে মানুষকে দেওয়া হয়েছে উন্নত মেধা বা স্মৃতিশক্তি। শুধুমাত্র মানুষকেই যে মেধা বা স্মৃতিশক্তি দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটি কিন্তু সে রকম নয়; স্মৃতিশক্তি দেওয়া হয়েছে কম-বেশি বিশ্বের সকল প্রাণীকেই। মেধা বা স্মৃতিশক্তি বর্ধন করে, সম্ভবত এমন কোনো দাওয়াই বা বটিকার আবিষ্কারই বর্তমান যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপহার বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য ব্যাপারটি নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন, তা কিন্তু নয়; বরং বিশ্বের অসংখ্য স্নায়ু মনোবিদ (Neuropsychologist) ও স্নায়ুতত্ত্ববিদ (Neurologist) এ নিয়ে দিন-রাত গবেষণায় লিপ্ত আছেন এবং স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও এর রাসায়নিক উপাদানসমূহের ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন। যেমন বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মানব মস্তিষ্কের স্নায়ুতান্ত্রিক পদ্ধতি (Neurological system)-এর মধ্যে ডেনড্রাইট (Dendrite) নামে এক বিশেষ তন্তু রয়েছে, যা আমাদের স্মৃতিশক্তির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা যে রকম দৈনিক খাদ্য গ্রহণ করি, তেমনি স্মৃতিশক্তিকে সতেজ রাখার জন্য মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে নিয়মিত খাদ্য দিতে হয়। আর মস্তিষ্কের এ স্নায়ুতন্তুগুলোর একমাত্র খাদ্য হচ্ছে শর্করা বা Sterch। বহু পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, যেসব খাবারে চিনি (Sugar) রয়েছে সেসব খাবারেই শর্করার প্রাচুর্য রয়েছে। অতএব সাধারণ কথায় বলা যায়, মিষ্টিজাতীয় খাবার খেয়েই আমরা স্মৃতিশক্তি সতেজকারী শর্করা পেতে পারি। সম্ভবত বাঙালি (জাতি)-এর মিষ্টি পছন্দ করার পেছনে এটি একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তবে তা যদি হয় Milk sterch বা দুগ্ধ শর্করা বা Lactose তবে সর্বাধিক ফল লাভ হয়।

যাই হোক, স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধান পেতে হলে আমাদেরকে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। অতীতে মানুষ এ বিষয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছে। ইংরেজি সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষীয়গণ স্মৃতিশক্তি বর্ধনের জন্য দারুচিনি খাওয়ার পরামর্শ দিতেন। তাতে কাজ না হলে বীভর (Beaver) এক প্রকার লোমশ প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি মস্তকাবরণী পরিধান করার পরামর্শ দিতেন। এই উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও মানুষ স্মৃতিশক্তিকে সতেজ রাখার জন্য মাথা নাড়া করে ক্যাস্টর অয়েল (Castor Oil) মাখত। মানব মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠনশৈলী এমন নিখুঁতভাবে কাজ করে যে, তা আমাদের নিকট মাত্র একটি প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- Sensory memory বা সংবেদন স্মৃতি, Short term memory বা স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি এবং Long term memory বা দীর্ঘকালীন স্মৃতি। প্রথম অংশটি আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গৃহীত ঘটনাসমূহ ধারণ করে। এটা অপরিমিত সংখ্যক তথ্য ধারণ করতে পারে, তবে খুবই অল্প সময়ের জন্য এবং খানিক পরে

তা আর পুনরুজ্জীবিত করা যায় না। স্মরণ রাখার জন্য Sensory memory-এর মাধ্যমে গৃহীত তথ্যগুলোকে আমাদের খুব দ্রুত দীর্ঘতর কোনো সেকশনে পাঠাতে হবে। আর সেটা হবে Short term memory বা স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি। মস্তিষ্কের এ অংশটি আমাদের কোনো কাজের উপর মনোনিবেশ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অধিক মনোনিবেশ করলে অধিক তথ্য ধরা পড়বে। সাধারণভাবে এটি একসঙ্গে ৭টি তথ্য সর্বোচ্চ ২০ সে. সময়ের জন্য ধারণ করতে পারে। দীর্ঘ সময় মনে রাখার জন্য তথ্যগুলোকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে Long term memory বা দীর্ঘকালীন স্মৃতিতে পাঠাতে হবে।

একে অপর কথায় স্থায়ী স্মৃতিও বলা যায়। এটা অগণিত সংখ্যক তথ্য ধারণে সক্ষম। এ অংশের স্মৃতি জীবনভরও টিকে থাকতে পারে। আমাদের Long term memory বা দীর্ঘকালীন স্মৃতি অনেকটা কম্পিউটারের Memory অংশের মতো কাজ করে। কম্পিউটার মেমোরিতে যেমন তথ্যাবলি দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায় তেমনি করা যায় মানব মস্তিষ্কের Long term memory-তে। পুনরায় মনে করার জন্য পুঞ্জীভূত স্মৃতিগুলোকে কল্পনার মাধ্যমে Short term memory বা স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিতে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক যেমন করে কম্পিউটার ডিস্কে রক্ষিত তথ্যসমূহ মনে করার জন্য প্রথমে তা স্ক্রিনে নিয়ে আসতে হয়। Sensory memory এর মাধ্যমে গৃহীত তথ্যাবলি Long term memory-তে পাঠাবার জন্য তা বারবার ঘাটাতে হয়। অর্থাৎ বারবার পড়তে হয়। একেই আমরা মুখস্থ করা বলে থাকি। একবার মুখস্থ করা কোনো বিষয়কে কিছুদিন পরপর পুনরুজ্জীবিত করলে তা আরও গভীর হয় এবং স্পষ্টতা লাভ করে। Long term memory-তে রক্ষিত কোনো বিষয়কে মনে করার জন্য বিভিন্নজন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন।

প্রাচীনকালে মানুষ আঙুলের মাথায় সুতা বেঁধে বসে থাকত পুরনো জিনিস মনে আনার জন্য। এখন আমরা কেউ মাথা চুলকাই, কেউ চোখ বুজে ভাবি, কেউ খাতায় লিখি বা আঁকাআঁকি করি, আবার কেউ বা অন্যের সাহায্য নিই। এসব করার পরও যখন মনে করতে পারি না তখন আমরা বলে থাকি ভুলে গেছি বা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। কিন্তু কথাটি একেবারেই ভুল। কারণ মস্তিষ্কের Long term memory-তে একবার স্থান পেয়েছে এমন জিনিস কোনো কালেও মুছে যায় না। তাহলে পাগল কোনোদিনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্রদের উচিত কোনো একটি বিষয় মুখস্থ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্মৃতি থেকে (না দেখে) বলে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আত্মপ্রসাদ লাভ না করা, বরং কিছু সময়ের ব্যবধান রাখা। কারণ কোনো একটি জিনিস শিখে সঙ্গে সঙ্গে বা না দেখে বললে হয়তো এমনও হতে পারে, এটি আমাদের মস্তিষ্কের Short term memory থেকে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে আমরা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে বলে বিভ্রান্ত হবো। যাক আবারও পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মুখস্থ বিষয় কখনও মুছে যায় না। আমাদের মস্তিষ্কের কোটি কোটি স্মৃতি তন্তুর কাজই হচ্ছে স্মৃতি ধারণ করে রাখা। এই কোটি কোটি স্মৃতি তন্তুর প্রতিটি আবার লক্ষ লক্ষ তথ্য ধারণে সক্ষম। অতএব অধিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। একটা শিখলে আরেকটা ভুলে যাবে। এসব কথা একেবারেই অমূলক

পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মগজ নিয়ে neurologist-দের অবিরাম গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বৃটিশ বিজ্ঞানীগণ নির্ণয় করে দেখিয়েছেন যে, আইনস্টাইনের মতো একজন চতুর্মুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তির সারা জীবন গবেষণা করার পরও তার মস্তিষ্কের মাত্র ১৭% ভাগ নিউরন ব্যয় হয়েছে। তাই আমাদের মস্তিষ্ক ফুরিয়ে যাবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি। এক একজনের চলন্ত বিশ্বকোষ বনে যাওয়াতেও কোনো সমস্যা নেই। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা দুর্বল স্মৃতির জন্য সর্বদা নিজেদের দোষারোপ করেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে– দোষটা নিজেদেরই, স্মৃতিশক্তির নয়; বরং কোনো বিষয়ে স্মৃতিতে ধরে রাখার কৌশলগত ত্রুটি বা দুর্বলতার কারণেই আমরা ভুলে যাই। অবশ্য neurological বা স্নায়ুতান্ত্রিক দৌর্বল্য এর জন্য দায়ী হতে পারে, যা আমরা নিজেরাই কাটিয়ে উঠতে পারি। স্মৃতিশক্তির উন্নয়ন বলতে মূলত স্মৃতিকর্মের দক্ষতার উন্নয়নকে বুঝায়। সাধারণ কতগুলো মনোবৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা এ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারি।

১। **নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন :** এ ক্ষেত্রে লব্ধ বিষয়সমূহকে নিজ স্মৃতির কোটায় সংঘটিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাকৃত বিষয় সমূহ বিস্মৃতি হওয়ার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম মেনে চলে। আর সেটি হচ্ছে কোনো একটি তথ্য বিস্মৃতির পর্যায়ে চলে গেলে তার পিছু ধরে আর একটি তথ্য বিস্মৃত হয়, তারপর আরও একটি; এভাবেই পুরো বিষয়টি একসময় স্মৃতি থেকে মুছে যায়। এটাকে বিজ্ঞানীরা chain of oblivion অর্থাৎ বিস্মৃতির ক্রমধারা বলে অবহিত করেছেন। একে রোধ করার জন্য আমরা মস্তিষ্কের মধ্যে মনে মনে কতগুলো কাল্পনিক প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করে নিতে পারি। প্রথমে আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মূল অংশটুকু আত্মস্থ করা। তারপর পুরো বিষয়টিকে কতগুলো শিরোনামে বিভক্ত করে নেওয়া এবং শিরোনামের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যগুলোও আত্মস্থ করে নেওয়া। পরে সময়ে সময়ে বিভক্ত শিরোনামগুলোর অধীন পুরো বিষয়টিকে স্মৃতির পর্দে জাগ্রত করা। তাহলে দেখব, আমাদের বিস্মৃতির পরিমাণ বিস্ময়করভাবে কমে গেছে। একটি বিষয় ভালোভাবে আত্মস্থ করার আগেই তার উপর দিয়ে আরেকটি শিখলে মনে করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়। তাই প্রথম বিষয়টিকে আগে ভালোভাবে হজম করে নিতে হবে।

২। **আবৃত্তি :** এখানে আবৃত্তি বলতে এই মাত্র শিক্ষাকৃত বিষয়টিকে বারবার পাঠ করাকে নির্দেশ করেছে। আবৃত্তির শাব্দিক অর্থও তাই বুঝায়। একটি বিষয়ে আবৃত্তি ধারণ ক্রিয়াকে মজবুত করে এবং প্রয়োজনের সময় পুনরায় স্মৃতিপটে জাগ্রত করাকে নিশ্চিত করে।

৩। **স্মৃতিচারণ :** একটি বিষয় শিখার কিছুদিন পর যখন দেখব তা আবার ভুলতে বসেছি; তখন সেগুলোকে একটু ঝালাই করে নিতে হবে। ভুলতে শুরু না করলেও, যদি পূর্বে শিখা কোনো জিনিস স্মৃতিচারণ করা হয় তাহলে তা মস্তিষ্ককে স্থায়ী আসন গেড়ে নিতে পারবে। স্মৃতিচারণ আগের শিখা কোনো কিছুকে পুনরায় সতেজ করে এবং প্রয়োজন স্বল্পায়াসেই তা আবার মনে নিয়ে আসতে সহায়তা করে।

৪। **সাময়িক বিরতি :** এ বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, কোনো কিছুকেই বসে গলাধঃকরণ করার চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শিখা অনেক ভালো। এটা মনোবিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ পড়ার মাঝে বিরতি বলে অবহিত করেছেন। এ বিরতি হতে পারে ৪০–৪৫ বা ৫০ মিনিট পর পর। ৪০–৪৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর আমরা ৮–১০ মিনিট বিশ্রাম নেব। বিছানায় চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে কিংবা মুক্ত বাতাসে হাঁটাহাঁটি করে এ বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। এর প্রথম ৫ মিনিট সদ্য পঠিত বিষয়টি নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে হবে, পরবর্তী ৫ মিনিট সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে থাকতে হবে। তারপর ঘরে ফিরে আবার পড়ায় মনোনিবেশ করতে হবে। এ কয়েক মিনিট বিরতি ঘণ্টাখানেক পড়ার চেয়ে বেশি উপকার রয়েছে।

৫। **নিদ্রা :** কোনো বিষয় শিখার পরপরই বিশেষত রাতের বেলায় যদি ঘুমিয়ে যেতে পারি তাহলে শিক্ষাকৃত বিষয়টির উপর অন্য কোনো বিষয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো চিন্তা এসে ভর করতে পারবে না। ফলে শিক্ষকৃত পাঠটি অবমিশ্রভাবে মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকবে। পরদিন ভোরে সেটাকে আবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করলে একবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৬। **ফিড ব্যাক :** ফিড ব্যাক বলতে সাধারণত কোনো একটি বিষয়ে মনে করার ক্ষেত্রে অপরের বা নেপথ্যের কোনো সহযোগিতা বোঝায়। যেমন– মঞ্চনাটকের বেলায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে Prompting করা হয়, সেটাও এক প্রকার ফিড ব্যাক। একটি পাঠকে আত্মস্থ করার পর পাঠকের পাঠের উন্নতি নির্দেশক কোনো সহায়তাকেও ফিড ব্যাক বলে। এখানে মূলত তাই বুঝানো হয়েছে। শিক্ষক ছাত্রের পড়া গ্রহণ করার সময় যদি আটকে যায় দু-একটি ক্ষেত্রে সহায়তা দেন তাহলে সেটিও হবে ফিডব্যাক। পড়া গ্রহণ করার সময় অধিকতর জটিল বিষয়গুলো সহজতর পন্থায় বুঝিয়ে দেওয়াটাই ফিড ব্যাক বলে গণ্য হবে। এভাবে ফিড ব্যাক প্রক্রিয়ায় পড়া শিখলে ছাত্র তার পাঠ্য বিষয়ের উপর পঠিত পুস্তক এবং শিক্ষক বা অন্যদের দেওয়া বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে আরেকবার তা সহজেই মনে নিয়ে আসতে পারবে তখন তাকে নিজের স্মৃতিশক্তি নিয়ে আর হতাশ হতে হবে না। আমাদের স্মৃতিশক্তির উপর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রারও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সাধারণত ১৮–২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মানব মস্তিষ্ক সবচেয়ে ভালো কাজ করে। বায়ুমন্ডলে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা যখন ৯৫% থেকে ৯৮% ভাগ থাকে তখন এর তাপমাত্রা এই পরিমাণ বিরাজ করে। আর আবহাওয়াবিদগণের মতে, বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা ৯৫–৯৮ ভাগ হলে অবশ্যই বৃষ্টিপাত হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, বর্ষণসিক্ত দিনের বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা হয় ১৮–২০ সেলসিয়াস। তাই বৃষ্টির দিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে না ঘুমিয়ে আমাদের উচিত পাঠে মনোনিবেশ করা। প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার। এই মস্তিষ্কের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার আবার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারহীনতা উভয়ই এর কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে। উচ্চ রক্তচাপ এবং নিম্ন রক্তচাপ দুটোই স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

আবার অতি অল্প নিদ্রার মতো অতি অধিক নিদ্রাও স্মৃতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা এবং এর উদাসীনতা এসব উপসর্গও পাঠ্যবিষয়ের উপর মনোনিবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে স্মৃতির ধারণক্ষমতাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্মৃতিশক্তিকে ধারালো রাখার জন্য নিরুদ্বেগ মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় ঘুমও আবশ্যক। নিয়মিত ফলমূল, শাকসবজি আর আঁশজাতীয় খাবার খেয়ে পাকস্থলীকে পরিচ্ছন্ন রাখাও এর জন্য প্রয়োজন। স্মৃতিশক্তিহীনতার জন্য অযথা দুশ্চিন্তা করে মানসিক চাপ বৃদ্ধি করলে স্মৃতি আরও বিরূপ প্রভাবে প্রভাবিত হয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা পাচক রস নিঃসরণ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে পাচন ক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়। মোট কথা, বর্তমানে এই তথ্য প্রবাহের বিশ্বে একটার পর একটা তথ্য আমাদের মস্তিষ্কের Memory disc-এ জমা হচ্ছে। এই তথ্যসমূহ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য অর্থাৎ প্রলম্বিত স্মৃতির অধিকারী হওয়ার জন্য আমাদের সুস্থ, সবল, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে হবে।

★ *প্রবন্ধকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর প্রকল্প কর্মকর্তা ও বিসিএস (সাধারণ) শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য।*

আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি

শাহিদুল ইসলাম

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। সমকালীন বিশ্বে আবিষ্কার জগতে বিস্ফোরণের কারণে জগতে মহাজাগরণের মহোৎসব চলছে আর এর ছাপ সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, আবিষ্কার ও চিন্তার জগতে ঢেউ লেগেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহায়ক। সে কারণে কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী সকলের মাঝেই কমবেশি বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে ইতিহাসকে রক্ষা করে। কাউকে রক্ষা করে অন্ধ আবেগ থেকে, দার্শনিককে বাঁচায় মতান্ধতার হাত থেকে, সমাজবিজ্ঞানীকে দেয় সামগ্রিক বিচারবোধ ক্ষমতা। বিজ্ঞান প্রযুক্তি মানুষের সামনে আসছে শক্তিশালী দানবের মতো। বিজ্ঞান আজ ব্যবহৃত হচ্ছে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ, সংস্কৃতির বিনিময় প্রভৃতি কাজে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে বিশ্বসমাজ আজ Global Village থেকে Global Family-তে পরিণত হয়েছে। Skype, Facebook, My Space এবং Twitter প্রভৃতি সাইটের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজ আজ হাতের মুঠোর ভিতর চলে আসছে। ওয়েব বেইজড ইনফরমেশন পদ্ধতিতে অডিও/ভিডিও কনফারেন্সিং করা যায়। বুলেটিং বোর্ড ব্যবহার হয়, রিজার্ভেশন সিস্টেমে অনলাইন ইলেকট্রনিক ফান্ড, ট্রান্সফার পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় দূরশিক্ষণ, অনলাইনে শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং গবেষণায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান বিপ্লব এনেছে। রোগীর বিভিন্ন প্রকার টেস্ট ও রোগ শনাক্ত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান। ই-হেলথ, এম হেলথ, টেলি হেলথ, টেলি কার্ডিওলজি, টেলি প্যাথলজি, টেলি ফার্মেসি ইত্যাদি। চিকিৎসকদের মধ্যে টেলিকনফারেন্সিং বা ভিডিওকনফারেন্সিং এর সাহায্যে হাইরেজুলেশন ছবি, অডিও ফাইল, রিয়েল সাইজ ভিডিও, রোগীর রেকর্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে পরামর্শ নেওয়া সহজ হয়ে গেছে।

ই-গভর্নমেন্টের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন নীতি যেমন পরিবেশনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রভৃতি জনগণকে অবহিতকরণ ও জনগণকে অধিকতর সমৃদ্ধকরণ এবং দুর্যোগে ও যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-টিকিটিং এমনকি ই-সিগনেচার এর নাম অধুনা উচ্চারিত হচ্ছে। অনলাইনে কোনো পণ্য পছন্দ করার পর অর্ডার দিলে বিক্রেতা গ্রাহকের পণ্যটি বাসায় পৌঁছে দেয়। দাম দেওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো অপশন থাকে; বিক্রেতা ক্রেডিট কার্ড বা চেক থেকে কিংবা নগদ টাকাতেও পেমেন্ট করার সুযোগ পান। প্রকাশনা শিল্পে বইপত্রের প্রচ্ছদ, লিফলেট, বিজ্ঞাপন, গ্রাফিক্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। ভাল একটি ওয়েবপেইজ তৈরির জন্য গ্রাফিক্স এর পাশাপাশি কিছু অ্যানিমেশন সফটওয়্যার ওয়েব প্রোগ্রামিং-এর প্রয়োজন হয়। সংবাদ অনলাইন পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের খবর পাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের পাশাপাশি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিনোদনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। ক্রিকেট, ফুটবল ও অলিম্পিকের মতো অনুষ্ঠান জীবন্ত পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। ডিজিটাল ফরম্যাটে ছবি তৈরি হচ্ছে অনেক ছবি প্রিমিয়াম হচ্ছে ক্যাবল টিভিতে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমাজ জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন:

- কম খরচে তথ্য আদান-প্রদান করা যাচ্ছে
- কাজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ডেটা স্থানান্তরে গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে
- শিক্ষার্থীদের জন্য দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে
- মানুষের শক্তির অপচয় কম হচ্ছে কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে

সাম্প্রতিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। মানুষের চিন্তা-ভাবনার অথবা বুদ্ধিমত্তার পদ্ধতির যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাটাই হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক্সপার্ট সিস্টেম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি স্তর। জেট প্লেন চালনা, রোগ নির্ণয়, কোনো ডিভাইসের ত্রুটি সংশোধন, যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়, খনি গবেষণা ও তৈল অনুসন্ধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক্সপার্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজ্ঞানের কৃত্রিম মানুষ তথা রোবট আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর ঘটনা। মানুষের মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে রোবট। ব্যবহৃত হচ্ছে খনি গবেষণা, সমুদ্রের তলদেশে, মহাকাশ গবেষণায়, গ্রহে, শিক্ষা কলকারখানায় প্রতিকূল পরিবেশে। মানুষের যেখানে কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রায়োসার্জারি এবং ক্রায়োথেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায়। বরফশীতল তাপমাত্রায় কোষগুলোকে ধ্বংস করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অস্বাভাবিক কোষকে ধ্বংস করে। বর্তমানে ত্বকের বিভিন্ন অসুস্থতা যেমন আচিল, মেছতা, তিল মেছতা এবং ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল ত্বক নয় যকৃৎ, পাইলস, মুখের ক্যান্সার, চোখের ক্যান্সার, হাড়ের ব্যথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রায়োসার্জারি ও ক্রায়োথেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশ গবেষণায় যুগান্তর সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তারার আলো ভূপৃষ্ঠে পড়া, মহাকাশ, ভিন গ্রহণ, পৃথিবী, ব্ল্যাকহোল, তারকারাজি, নীহারিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে মহাকাশ যানের গতিপথ নির্ধারণ, জ্বালানি, তাপমাত্রা, দিকনির্দেশনা ও সিগনাল প্রেরণে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কম্পিউটার ব্যবহার করে নিখুঁত মাপের পার্টস তৈরি, যেমন কম্পিউটারের পার্টস, গাড়ির পার্টস, DVD প্লেয়ারের পার্টস প্রভৃতি। পছন্দ অনুযায়ী রং তৈরি এবং বিভিন্ন কোম্পানির গাড়ির ত্রুটি নির্ণয়ে আজ কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত চালকবিহীন মিসাইল প্রতিপক্ষের রাডারকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যস্থলে আঘাত করতে পারে।

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রাডার দিয়ে শত্রু বিমানের আগমনী বার্তা, অবস্থান এবং গতি শনাক্ত করা ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে চালকবিহীনভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে পারে। প্রচলিত নিউক্লিয়ার মিসাইলের বদলে স্বনিয়ন্ত্রিত ন্যানো মিসাইল তৈরি হবে, যা কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারবে।

প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বায়োম্যাট্রিক্স পদ্ধতি আঙুলের ছাপের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। অস্ট্রেলিয়াতে স্মার্ট সিস্টেম এবং ই-পাসপোর্ট সিস্টেমে বায়োম্যাট্রিক্স প্রাইভেসি কোড-এর ব্যবহার হয়। ব্রাজিলে আঙুলের ছাপভিত্তিক পরিচয়পত্র ব্যবহার করে। তাদের ই-পাসপোর্টে স্বাক্ষর স্থান এবং দশ আঙুলের ছাপ ও বায়োম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকে। আমাদের দেশে ভোটার আইডি কার্ডে বায়োম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমান ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্টেও বায়োম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি কৃষি, বায়োটেকনোলজি, ঔষধ তৈরি, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে ফুলারিনের তাপ প্রতিরোধী এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় ন্যানোপ্রযুক্তিতে এর ব্যবহার করা হয়। ন্যানোরোবট মানবদেহের ভেতর অস্ত্রোপচার করতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। ক্যান্সার কোষ ধ্বংসে ন্যানো সুচ ব্যবহার হবে, যা আমাদের মাথায় চুলের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সরু হবে। ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করার গবেষণা চলছে। ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে গাড়ি তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। বর্তমানে হার্ডডিস্কের তথ্য ধারণ ক্ষমতার যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার পিছনেও কাজ করছে ন্যানো প্রযুক্তি।

মানুষের মেধা মনন ও আবিষ্কার দ্বারা এমন যন্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে যার দ্বারা মানুষ বসে থাকবে কিন্তু দাসের মতো খাটবে যন্ত্র। বিলাস সামগ্রী এবং রসনার দ্রব্য ও ভোগ্য পণ্য তার মুখের কাছে চলে আসবে। মানুষ আনন্দের সাথে ভোগ করতে থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিচ্ছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ আজ সভ্যতার গগনচুম্বে অবস্থান করছে, তবে এর নেতিবাচক দিকও রয়েছে।

আধুনিক কম্পিউটা'র চালনায় বিভিন্ন কম্পিউটার অপরাধ সংঘটিত হয়। যেমন- সফটওয়্যার পাইরেসি কপিরাইট লঙ্ঘন, হার্ডওয়্যার চুরি, ডেটা চুরি, প্লেজিয়ারিজম প্রভৃতি। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে সমাজ জীবনে কিছু কুফলও সংঘটিত হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশৃঙ্খল সংস্কৃতি ও ভায়োলেন্সপূর্ণ গেম তরুণ-তরুণীদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে করছে অপরাধমূলক। ইন্টারনেটে এমন কিছু অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ সাইট রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটতে পারে। হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি চুরি হয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া, পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার চুরি হওয়ার মাধ্যমে তথ্যের গোপনীয়তা আর থাকছে না। বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন– কোমর, হাত, কব্জিতে ব্যথা, হৃৎপিণ্ড, কান ও মস্তিষ্কের রোগ ও মানসিক জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিগ্রস্ততা, ডিজিটাল ডিভাইড এমনকি মিথ্যা প্রচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ব্লগ সাইটে কারও ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, সংবাদ এডিট করে মিথ্যা ছবি বা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন বা মানহানি করা হচ্ছে। এসব কাজের মাধ্যমে ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির কুফল এবং কম্পিউটার অপরাধের কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নীতির প্রশ্ন উঠছে। নীতিবিজ্ঞান একটি দার্শনিক চিন্তা

যা বর্তমানে দর্শনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানুষ ও সমাজের ক্ষতি হোক এটা কোনো মতাদর্শের মানে হতে পারে না। সামাজিক অবক্ষয় নৈতিক অধঃপতন এবং চিন্তা-চেতনার সংকীর্ণতা আমাদের সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। পৃথিবীতে যেসব প্রচলিত ধর্ম এবং মতাদর্শ আছে তার ভেতর সত্য তত্ত্ব ও মানব সমাজ এবং সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ ও ধর্ম পালন এক্ষেত্রে ফলদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সাময়িক মুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর স্বার্থে সফল হওয়া এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শ আমাদের সকল প্রকার অশান্তি ও জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে সকল প্রকার অশান্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাক মানব সমাজ এই কামনা করছি আন্তরিকভাবে।

তথ্যসূত্র :

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি–মাহবুবুর রহমান

২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্ত–বর্ণালী খাঁ

৩। Encyclopaedica of Britanica

৪ বাংলাপিডিয়া/দৈনিক ইত্তেফাক/প্রথম আলো

বি.দ্র.: বর্ণালী খাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বই থেকে বহুল পরিমাণে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

★ *প্রবন্ধকার ইস্পাহানী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকার দর্শন বিভাগের প্রভাষক।*

সূর্য ভিটামিন

আমানুল ইসলাম

"আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোর দূত সূর্যে আর ফেরেনা, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন কাজে লাগে কে জানে।"

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)

সূর্যের আলো ত্বকের উপর এসে পড়লে একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান তৈরি হয়। একে আমরা বলি ভিটামিন ডি। বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই সূর্যালোকিত থাকে। সেদিক থেকে দেখলে সূর্য ভিটামিন শরীরে প্রচুর পরিমাণে থাকার কথা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন ডি আছে কি? ধারণা করা হচ্ছে পরিবর্তিত জীবনযাপন প্রণালী, খাদ্যাভ্যাস, বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং পরিবেশে উচ্চ মাত্রার টক্সিক বা আপদনাশক থাকার কারণে শহুরে ও গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সহজলভ্য এই সূর্য ভিটামিনটির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

ভিটামিন ডি রসায়ন

একজন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ৯০ ভাগ ভিটামিন ডি বা ক্যালসিফেরল শরীরেই তৈরি হয়। যখন ত্বক অতিবেগুনি রশ্মিতে (সূর্য) উন্মোচিত থাকে তখন ত্বকে থাকা প্রোভিটামিন ডি রূপান্তরিত হয়ে প্রিভিটামিন ডি'তে পরিণত হয়। এরপর শরীরের তাপমাত্রার সাহায্যে আইসোমারিত হয়ে ভিটামিন ডি৩ রূপে রক্তের মাধ্যমে কিডনিতে পরিবাহিত হয়। এখানে ভিটামিন ডি৩ পরিবর্তিত হয়ে হয় ২৫-হাইড্রোক্সি ভিটামিন ডি। এটি কিডনিতে এসে সক্রিয় অবস্থা ক্যালসিট্রায়লে পরিণত হয়। ক্যালসিট্রায়ল শরীরের ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য রক্ষায় খুব প্রয়োজনীয়। পাশাপাশি এটি হরমোন হিসেবে কাজ করে ও রক্তে ক্যালসিয়াম-ফসফেটের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রাপ্তির জন্য সূর্যালোকে ত্বকের অনুমোদিত উন্মোচনকাল নির্ভর করে ত্বকের ধরন, সময় ও স্থান, এছাড়াও আছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পোশাক-পরিচ্ছেদ। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিচালিত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, সমস্ত শরীর সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির বিকিরণে উন্মোচিত থাকলে ত্বক গোলাপি বর্ণ ধারণ করে (এক ইরাইথামাল ডোজ) যা মুখের সাহায্যে ২৫০–৬২৫ মাইক্রোগ্রাম (১০,০০০–২৫,০০০ আই.ইউ.[১]) ২৫-হাইড্রোক্সি ভিটামিন ডি গ্রহণের সমতুল্য। ত্বকের এক চতুর্থাংশ অংশ উন্মোচিত থাকলে বা শুধুমাত্র হাত, বাহু বা মুখমণ্ডল উন্মুক্ত থাকলে এক ইরাইথামাল মাত্রার অতিবেগুনি রশ্মি ১০০০ আই.ইউ. মাত্রার সমতুল্য খাবার ভিটামিন ডি তৈরি করে। বর্তমানে রক্তে ২৫ডি হচ্ছে ভিটামিন ডি-এর আদর্শ পরিমাণ। খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের

বিশেষণ ও রক্ত ও হাড়ের ক্যালসিয়ামের বিনিময় ঘটানো এ খাদ্যপ্রাণের প্রধান কাজ। তাই হাড় ও দাঁত গঠনে এর ভূমিকা সুস্পষ্ট। কারণ এ দুটি মৌলিক পদার্থ হাড় ও দাঁত তৈরির প্রধান কাঁচামাল। তবে ভিটামিন ডি-এর অভাবে খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ব্যবহৃত হতে পারে না। এ দুটি পুষ্টি উপাদান না থাকলে 'ডি' কোনো কাজে লাগে না।

বিস্ময়কর ভিটামিন

ভিটামিন ডি-এর যেসব উপকারিতাসমূহ প্রাথমিকভাবে জানা আছে তা হাড়ের সাথে সম্পর্কিত। 'ডি' এর অভাব হলে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হাড় সছিদ্র ও ভঙ্গুর হতে পারে, যাকে অস্টিওপোরোসিস বলে। সাম্প্রতিক সময়ে এই খাদ্যপ্রাণটিকে বিস্ময়কর ভিটামিন বলে অভিহিত করা হচ্ছে। কারণ ভিটামিন ডি-এর অণুগুলো বিপুল আকারে বিভিন্ন উপকারী ভূমিকা প্রদর্শন করছে। বিশ্বের নানা প্রান্তের গবেষণাগুলো বলছে, এটি স্ক্লেরোসিস, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, বাচ্চা হবার প্রাক্কালে প্রি এক্লাম্পসিয়া, জন্মের সময় স্বল্প ওজন ইত্যাদি রোগ হতে রক্ষা করে। এছাড়াও টিবি রোগ, হাঁপানি, পার্কিনসন রোগ, স্মৃতি বৃদ্ধি ও স্থূলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন (আইওএম)-এর ২০১১ সালের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে ভিন্ন কথা। তাদের মতে ভিটামিন ডি-এর সাথে অসংখ্য রোগ সম্পর্কিত বলে যে তথ্যটি দেওয়া হচ্ছে তার ভিত্তি দুর্বল। আইওএম আরও বলছে, এ পর্যন্ত এটি নিয়ে যা জানতে পারা গেছে ও স্ববিরোধী কিছু প্রমাণ আসাতে ভিটামিন ডি-এর শক্তিশালী ভূমিকাকে শুধু অনুকল্প হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে। এখনই প্রাপ্ত ফলাফলকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবহার সমীচীন হবে না।

এত উৎস তারপরও ভিটামিন ডি ঘাটতি

রোদে বের হবার সুযোগ যাদের নেই, তাদের দেহেই 'ডি' ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে। খাবারে কম পরিমাণে থাকলে পর্দানশীল মানুষের ক্ষেত্রে 'ডি'-এর ঘাটতি দেখা যাবে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ যেমন লাতিন আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি রয়েছে। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকাতে প্রচুর সূর্যালোক আছে। পশ্চিম এশিয়ার মানুষ লম্বা ঢিলা পোশাক পরিধান ও ধর্মীয় কারণে সমস্ত মস্তক আবৃত রাখেন। এই পরিস্থিতি 'ডি' তৈরিকে ব্যাহত করে। আফ্রিকায় ত্বকে প্রচুর মেলানিন পিগমেন্ট থাকায় ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে কি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এদেশে 'ডি' ঘাটতির পেছনে রয়েছে পরিবর্তিত জীবন যাপন, খাদ্যাভ্যাস এবং ক্রমশ বাড়তে থাকা পরিবেশ দূষণ। তারা বলছেন, শহুরে মানুষ ঘরকুনো হচ্ছেন। শহরের ঘরবাড়িগুলো খুব ঘিঞ্জি বা এক বাড়ির সঙ্গে আরেক বাড়ি সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। এটি অতিবেগুনি রশ্মির প্রবাহকে কমিয়ে দেয়। আছে উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠের স্বল্পতা। অনেকের মধ্যে বেশিক্ষণ রোদে থাকলে ত্বক কালো হয়ে যাবার ভয়ও কাজ করে। ইসলাম ও অন্যান্য (২০০৮) এর গবেষণায় বলা হয়েছে, গার্মেন্টসে যেসব নারী শ্রমিক

কাজ করেন তারা দীর্ঘ সময় ধরে কাজের খাতিরে কর্মস্থলে আবদ্ধ থাকেন, খুব সকালে স্বল্প সময়ের জন্য নিম্ন তীব্রতার সূর্যালোকে থাকা হয়, বাইরের বায়ু দূষণ, ব্যাপক মাত্রায় সানস্ক্রিন ব্যবহার ইত্যাদির সাথে কালো পিগমেন্ট যুক্ত ত্বকের ফলে তাদের শরীরে প্রয়োজনের কম পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ডি পাওয়া গেছে।

তাছাড়া বাড়তে থাকা পরিবেশ দূষণ বায়ুমডলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশকে বাধা দেয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, দেশের সাধারণ মানুষের খাবারে ভিটামিন ডি জাতীয় উপাদানের অনুপস্থিতি কেবল প্রাণিজ খাদ্যেই খাদ্যপ্রাণ ডি পাওয়া যায়। মাছের যকৃৎ সর্বোৎকৃষ্ট উৎস, তবে সকল প্রাণীর যকৃৎ, মগজ ও প্লীহায় এটা জমা হয়। ডিম ও দুধে কিছু ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তে থাকা মানুষজন প্রায়ই এসব খাবার খাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। আর্থিক বৈষম্য, স্বল্প পুষ্টিজ্ঞান এই অবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী। চিকিৎসকরা তাদের রোগীকে 'ডি' যুক্ত তৈরি খাবার ও ওষুধ খেতে বলেন. আর দেখা যায় 'ডি'র অনেক প্রাচুর্য থাকার পরও ভিটামিন প্রস্তুতকারী ওষুধ ও ফুড কোম্পানিগুলোর ব্যবসার বাড়-বাড়ন্ত অযাচিতভাবে 'ডি' গ্রহণেও আছে বিপত্তি। অধিক ভিটামিন ডি গ্রহণে রক্তে ও মূত্রে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়, যা কিডনিতে নানা সমস্যা তৈরি করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরীক্ষণ জরিপের ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসের একটি প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, পরিবেশে আপদনাশক (পেস্টিসাইডস) ছড়িয়ে থাকলে ও তার সংস্পর্শে আসলে তা শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিকে অবদমিত করে। এছাড়া বিভিন্ন সানস্ক্রিন ক্রিম ও ত্বক উজ্জ্বলকারী প্রোডাক্ট অনেক সময় শরীরে অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশকে বাধা দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এসব বিষয় ভিটামিন ডি-এর অপ্রতুলতা তৈরি করে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব মেডিসিন (আইওএম) সানস্ক্রিন সম্পর্কে আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করে।

উপসংহারের বদলে

আইওএম-এর সর্বশেষ সুপারিশ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন ডি প্রয়োজন প্রতিদিন ৬০০ আই.ইউ.। 'উন্নয়নশীল' দেশের মানুষকে পর্যাপ্ত সময় সূর্যালোকে অতিবাহিত করার সুপারিশ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবেশের সাপেক্ষে কতটুকু পরিমাণ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি কত সময় ধরে গ্রহণ করা প্রয়োজন সে রকম কোনো তথ্য নেই। বিভিন্ন চিকিৎসক তাদের মতো করে একটি মানদণ্ড ব্যবহার করে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। ডা. নাজমুল কবীর কোরেশীর মতে, ২০ ন্যানোগ্রাম পরিমাণ ভিটামিন ডি থাকতে হবে প্রতি মিলিলিটার রক্তে, যদি সুস্থ থাকতে চান। এই মাত্রা পূরণ করতে হলে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত দরকার অন্তত দৈনিক ৬০০ আই.ইউ এবং সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তিদের ৮০০ আই.ইউ.। তাঁর মতে, দশটা থেকে বেলা তিনটার মধ্যে সপ্তাহে দুই দিন কেউ যদি অন্তত ৫ থেকে ৩০ মিনিট সূর্যালোক গায়ে মাখেন, তবে তা যথেষ্ট।

দেশের কর্তৃপক্ষ এখনও এদিকটিতে তেমন নজর দেননি। পরিস্থিতির দিকটি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্টরা তৎপর হবেন এমনটাই আশা। রোদের দেশে থাকলেই ভিটামিন ডি-এর অভাব হবে না এমন আত্মপ্রসাদ উপভোগ করার কোনো কারণ নেই। আর সবারই দেখা উচিত যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি সূর্যালোক বা খাবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

১. খাদ্যপ্রাণ ডি পরিমাপ করার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক একক বা সংক্ষেপে আই.ইউ. নামে অভিহিত করা হয়। এক মাইক্রোগ্রাম সমান ৪০ আই.ইউ.।

তথ্যসূত্র :

১. ভিটামিন ডি কমপ্লেক্স, ডাউন টু আর্থ পত্রিকা, মার্চ, ২০১৩;

২. মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি, মো: মামুনুর রশিদ, বাংলা একাডেমি;

৩. ইসলাম, এম.জেড. ও অন্যান্য; ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এন্ড লো বোন স্ট্যাটাস ইন এডাল্ট ফিমেল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ, ২০০৮;

৪. ডা. নাজমুল কবীর কোরেশী, সুস্থতার জন্য ভিটামিন ডি, প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০১৩।

★ *প্রবন্ধকার অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠন, ৪৮/১, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা ১২১৪ এর সভাপতি।*
email : progoti17@gmail.com

BAN... Dhaka

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANSDOC Library * Dhaka *

জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের সময়

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ (শুক্র বার সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা এবং দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত)

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮